মায়া
মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল

মায়া

মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল

হাসপাতালে রুমের বাইরে বসে আছে আরাফাত আর তার বৃদ্ধ মা। আরাফাতের বাবা হটাৎ স্ট্রোক করেছে। ডাক্তার বলেছে অবস্থা বেশি ভালো না। ব্রেনের মধ্যে প্রচুর পরিমানে রক্ত ক্ষরন হয়েছে। আরাফাত তার মায়ের রুক্ষ হাত ধরে বলল, চিন্তা করো না মা। বাবা ভালো হয়ে যাবে। আবার হাঁটতে পারবে, আবার আমাদের সাথে কথা বলতে পারবে। তুমি শুধু আল্লার নাম ডাক। তার মা যেন পাথর হয়ে গেছে। এই বয়সে বেশি কিছু ভাবতে পারে না।
কয়েকমাস অনেক ধকল গেছে তার। অসুস্থ স্বামীকে যেকিনা বিছানা থেকে উঠতে পারে না, হাঁটতে পারে না, দু কাঁধে ভড় দিয়েও চলতে পারে না, তার পাশে বসে থেকে তার সকল ফরমায়েস পালন করা। খাওয়াদাওয়া সহ পেশাব পায়খানা করানো, এগুলো করা যে কত কষ্ট তা শুধু তারাই জানে যাদের এরকম পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে।

রুম থেকে একজন নার্স বেরিয়ে এসে বলল আপনারা দুজন রোগীর কাছে যেতে পারেন। তবে খুব সাবধান! তার সাথে বেশি কথা বলবেন না। তার সিচুয়েশন বেশি ভালো না।

নার্সের কথা শুনে আরাফাত আর তার মা ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গেল তার বাবার বেডের দিকে। তার বাবা ঘুমিয়ে আছে। দুজনে আস্তে করে খাটের মধ্যে বসল। যাতে কোন ধরনের শব্দ না হয়। এমন সময় আরফাতের স্ত্রী আর তার ছোট্ট মেয়ে এসে ঢুকল রুমের ভিতর। আরাফাত তার বউ আর মেয়ের দিকে তাকিয়ে মুখে আংগুল দিয়ে ফুস করে বলল, বাবা ঘুমাচ্ছে।

সুমনা তার মেয়েকে পাশের একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে নিজে আস্তে করে বেডের উপর গিয়ে বসল। সামাদ সাহেবের বুকটা কিছুক্ষন পরপর উপরের দিকে উঠছে, আবার নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। আরাফাত তার বাবার মাথায় হাত রাখল। এই কয়েকমাস আগেও তার বাবার মাথা ভরা চুল ছিল। প্রতি মাসে সেগুলো সেলুনে গিয়ে কেঁটে আসত। এই কয়েকমাস ব্যাবধানে সেই চুল উঠে গিয়ে সেখানে টাক গজিয়েছে। এরকম হলে কি এমন মানুষের চুল উঠে যায়?

আরাফাত তার বাবার মাথায় হাত দেওয়ায় তার বাবার কপালের বাম পাশটা কেমন যেন কেঁপে উঠল। ঠিক যেমন কোন গবাদি পশুর শরিরে হাত লাগলে কেঁপে উঠে। সুমনা তার মেয়েকে বলল, তোমার দাদার জন্য আল্লার কাছে দোয়া করো। বলবে, আল্লাহ! তুমি আমার দাদাকে ভালো করে দাও।
তার ছোট মেয়েটা বুঝতে পারে তার দাদার কিছু একটা হয়েছে। তাই সে তার মাকে বলে, আম্মু! দাদার কি হয়েছে?
- তোমার দাদার অনেক শরির খারাপ হয়েছে মা।
- দাদা আমার সাথে কথা বলছে না কেন?

- বলবে! তোমার দাদা ভালো হলেই আবার তোমার সাথে কথা বলবে।

সামাদ সাহেবের চোখটা একটু সময়ের জন্য নড়ে উঠল। জ্ঞান ফিরবে বোধয়। তাই সবাই একটু সামাদ সাহেবের দিকে ঝুকে তাকাল।
হ্যা। সামাদ সাহেবের জ্ঞান ফিরেছে।
সামাদ সাহেব তাকিয়ে দেখল, তার পাশে সবাই রয়েছে। তার স্ত্রী আর তার ছেলে, তার ছেলের বউ। মায়া?
কিন্তু মায়া কোথায়? মায়া তো আমাকে ছেড়ে না এসে থাকতে পারবে না! সামাদ সাহেব তার ঘাড় ঘুড়াতে পারলেন না। অতটা শক্তিও তার নেই। মনে হচ্ছে পুরো শরির দিয়ে ঠেলেও তার ঘাড়ের এক শতাংশও নাড়ানো সম্ভব হবে না।

নাহ্! হচ্ছে না। কোনোভাবেই সামাদ সাহেব তার মাথাটা নাড়াতে পারছে না। সামাদ সাহেব তার হাতটা কোনভাবে উপরের দিকে তুলে আরাফাতের দৃষ্টি আকর্ষণ করাল। আরাফাত তার বাবার মুখের কাছে কান নিয়ে বলল, কিছু বলবে বাবা?
সামাদ সাহেবের কথা বলার ক্ষমতা কমে গেছে। সে তার ছেলের কানের কাছে গিয়ে ফ্যাস ফ্যাস করে একটা শব্দই বলল সেটা হল, মায়া!

আরাফাত বুঝতে পেরেছে মনে হয়। আরাফাত তার মেয়েটাকে হাত দিয়ে টেনে এনে বলল, তোমার দাদার সাথে একটু কথা বলো।

মায়া সামাদ সাহেবের মুখের সামনে এগিয়ে আসল। এসেই বলল, দাদা! তুমি তো আমাকে অনেক দিন ধরে ঘুড়তে নিয়ে যাও না। তুমি যখন আবার হাঁটতে পারবে তখন আবার আমরা ঘুড়তে যাব। ঠিক আছে?

সামাদ সাহেবের বুকটা যেন ফেঁটে যাচ্ছে তার ছোট্ট নাতনীর কথা শুনে। সাথে সাথেই কান্নায় ভেঙে পড়ল সে। আহ্! সেই দিনগুলি কত সুন্দর ছিল। যখন মায়ার জন্ম হল, সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছিল সামাদ সাহেব। সেদিন নিজে গ্রামের সবাইকে মিষ্টি খাইয়েছিল। আস্তে আস্তে চোখের সামনে সেই ছোট্ট মায়া অনেক বড় হয়ে গেল। ওকে নিয়ে কত মজা, কত জায়গায় ঘুড়তে যাওয়া। সকালবেলা রাস্তায় ঘুড়তে যাওয়া আর সুর্যাদয় দেখা। দোকানে গিয়ে কত কিছু খাওয়া। আহ্! সেই দিনগুলি কত মজার ছিল।
আর ফিরে আসবে না সেই হারানো সময়। আর ফিরে আসবে না সামাদ সাহেবের ছোটবেলার দিনগুলি। মায়ের কত বকা খেয়েছে সে। সবাই মিলে পুকুরে একসাথে সাঁতার কেঁটেছে। সেই পুরোনো খেলা, দাদীর পুরোনো দিনের বানানো পিঠা। কোন একটা অলৌকিক নব ঘুড়িয়ে যদি সেই হারানো সময়গুলো ফিরে পাওয়া যেত! সৃষ্টিকর্তার কি আযব সৃষ্টি! কোন সময় চলে গেলে সেই সময় আর কক্ষনো, কক্ষনো ফিরে আসবে না।
- কি হল দাদা! কথা বলছ না কেন?

সামাদ সাহেব এতক্ষন শুধু তার নাতনীর দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। তার বলতে ইচ্ছে করছে, না দাদু! আমার সময় ফুরিয়ে গেছে। হাজার চেষ্টা করেও সেই সময় আর আসবে না দাদু! এখন তোমাকে আমাকে ছাড়াই ভালো থাকতে হবে। আমাকে ছাড়াই এই জীবন উপভোগ করতে হবে।
কিন্তু সেই কথাটা তার প্রিয় নাতনীকে আর বলা হল না। চোখ দিকে আবার এক স্রোত জল বেরিয়ে গেল।

মায়া তার বাবাকে বলল, দাদা কান্না করছে কেন?
সামাদ সাহেব বুঝতে পারলেন তার ছেলেটাও এই মূহুর্তে তার জন্য কান্না করছে।

ছেলেকে সামাদ সাহেব বুঝাতে চেষ্টা করল, কান্না করছিস কেন? কেঁদে লাভ কি? দুনিয়ার ভালোবাসা তো চিরোদিন থাকে না। শান্ত হ বাবা, শান্ত হ। তো মেয়েটা ভারী মিষ্টি। ওকে কিন্তু দেখে রাখিস। চোখের আড়াল করবি না। আর তোর মার-ও একটু যত্ন নিস! বেচারির কয়েকদিন অনেক ধকল গেছে। তোর মাকেও চোখের আড়াল করবি না।
তোর বউটাকে মাঝে মাঝে আমি অনেক সময় আমি বকেছি। রান্না খারাপ হলে মাঝে মাঝেই আমি ওর নিন্দা করেছি। নিজের মেয়েটাকেই সামলাতে পারে না, সে কারনেও বকেছি। তবে আজকে বলছি, তোর বউটা খুব ভালো। ওরো খেয়াল রাখিস! তোকে বড্ড ভালোবাসে। কেউ ভালোবাসা দিলে তার হক রাখিস।

কিন্তু তার নীরব কথাগুলো কি তার ছেলে বুঝতে পেরেছে?

এতোটা বছর সে কত কথা বলেছে। কোনদিন তার ছেলেকে এত্তো এত্তো উপদেশ দেয় নি। আজ যখন নিজের কথা বলার শক্তি হাড়িয়ে ফেলেছে তখন নিজের ছেলেকে অনেক উপদেশ দিতে ইচ্ছে হচ্ছে। আজকে এই শেষ বয়সে সামাদ সাহেব নিজের জবানের গুরুত্বটা বুঝতে পারছে।

অনেক কথা বলতে ইচ্ছে করছে। হাঁটতে ইচ্ছে করছে। সেই ছোটবেলার মত দৌড়াতে ইচ্ছা করছে।

সে আবার তার ছেলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। আরাফাত আবার তার বাবার মুখের কাছে কান নিয়ে বলল, কি বলবে বাবা?
বুকের ব্যাথাটা বেরে গেল এই মূহুর্তে। মনে হচ্ছে বুকের উপর বিশাল একটা পাথর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আহ্! কে যেন সেই পাথরটা আবার চেপে ধরেছে। কি কষ্ট! কাউকে যদি একটু বোঝানো যেত! মনে হচ্ছে, সেই পাথরের ভরে বুকের খাঁচাটা ফেটে যাবে।
ইচ্ছে করছে হাত পা ছুড়ে সবাইকে বোঝানোর। কিন্তু কিসের যেন একটা অদৃশ্য শক্তি তার হাত পা চেপে ধরে আছে। আর সহ্য করতে পারা গেল না।

আরাফাতের কানের কাছে কিছু বলতে ইচ্ছে করছে। দুটো বাক্য বলার জন্যই এখন তাকে নিজের সাথে যুদ্ব করতে হচ্ছে।
অনেক চেষ্টা করে অবশেষে দুটা শব্দই তার মুখ দিয়ে বের হল,
- ভালো থাকিস।

আরাফাত থমকে গেল। সবাই আমার দিকে এগিয়ে আসল।
দম বন্ধ হয়ে আসছে কেন? একি! আমার সাথে এমন হচ্ছে কেন? আমি নিশ্বাস নিতে পারছি না। গলা দিয়ে অদৃশ্য কি যেন একটা বের হয়ে যেতে চাইছে। আমি মারা যাচ্ছি।
না।
আমি বাঁচতে চাই। উফ্! সহ্য করা যাচ্ছে না। শরিরের নিচের অংশটা পাথর হয়ে যাচ্ছে বোধয়। আস্তে আস্তে সেটা উপরের দিকে উঠতে লাগল। আরো উপরে উঠছে, আরো উপরে। গলা পর্যন্ত উঠে পরেছে। মনে হচ্ছে কেউ যেন গলাটা জোরে চেপে ধরেছে।
আমি কি তাহলে এখন মারা যাচ্ছি? মড়া এতো কষ্ট?
শরিরটা ঘেমে ভিজে গেছে। গায়ে জড়ানো কম্বলটা ভিজে ঠান্ডা হয়ে গেছে। ঠিক এই সময় ঝাকি দিয়ে ঘুমটা ভেঙে গেল সামাদ মিয়ার।

ভয়ে কাপঁছে তার পুরো শরির। তারমানে সে এতক্ষন যাবৎ সবকিছু সপ্নে দেখল। বুকের বা পাশটা এখনো ধপ ধপ করছে। বিছানা থেকে দ্রুত উঠে বসে পড়ল সামাদ মিয়া। পাশে রাখা মোবাইলটার ঘড়ি একবার দেখে নিল। রাত দুটো ছুই ছুই। এই সময় তো কোনদিন এরকম সপ্ন দেখে না সে! পাশেই তার স্ত্রী রীমা ঘুমিয়ে আছে। মেয়েটার বেশ কয়েকদিন ধরে জ্বর। যাক! আজকে একটু আরাম করে ঘুমিয়েছে। আগের দিন তাকে একটু সময়ের জন্যও ঘুমাতে দেয় নি রীমা। এই রাতের বেলা উঠে মাথায় পানি দাও। আবার একটু ঘুমাও। আবার উঠে জলপট্টি দাও।
দিনের বেলায়ও একি অবস্থা। নিজের ব্যাবসা সামলাতে হয়। এখন আবার নিজের বউকে সামলাতে হচ্ছে। সেই মানসিক চাপের জন্যই মনে হয় এরকম আবলতাবল সপ্ন দেখছে সামাদ মিয়া।

কিন্তু তার ভয়টি এখনো বিতারিত হয় নি। মনে হচ্ছে, সত্যিই কি মৃত্যু এতো কঠিন?
মায়া! এই বাচ্চা মেয়েটাকে আমি আগে কখনো দেখেছি বলে তো মনে হচ্ছে না। হয়তো দেখেছি নয়তো দেখিনি।

সারারাত তার চোখে আর ঘুম আসবে না মনে হয়। হয়তো একটু সময়ের জন্য চোখ বুজে এসেছিল তবে সেটাকে ঘুম বললে ভুল হবে। সেই সপ্নটার কথা তার মাথা থেকে গেল না। রীমার কপালের জলপট্টিটা গরম হয়ে শুকিয়ে গেছে। সেটা আবার পাশের বাটিতে ভিজিয়ে ভালোভাবে চিপে দিয়ে তা আবার কপালে দিয়ে দিল।

সকালবেলা সামাদ মিয়ার ঘুম ভাংল। তারমানে সে ঘুমিয়েছিল! যাক! ঘুমটা হয়ে ভালোই হয়েছে। পাশে দেখল রীমা নেই। বাইরে গেছে হয়তো। তাদের একটা খাটে সামাদ মিয়া আর তার স্ত্রী রীমা আর আরেক খাটে তার ছেলে রিফাত ঘুমায়। রিফাত মনে হয় এখনো জাগে নি। ওর ঘুম থেকে উঠতে উঠতে আটটা বেজে যাবে।
সামাদ মিয়া দেখতে পেল রীমা দরজা দিয়ে ঢুলে ঢুলে প্রবেশ করল। সামাদ মিয়া দেখে বলল, জ্বর কমেছে?
- হ্যা।
- মাথা ঘুড়াচ্ছে?
- হ্যা।
- তোমাকে তাহলে আজ কোন কাজ করতে হবে না। তুমি বরং শুয়ে থাক।
- আমি শুয়ে থাকলে রান্না করবে কে?
- তোমার শরিরটা ভালো না। আজকে আমি সামলে নেব।

নিজের বউটাকে অনেক ভালোবাসে সে। বাসবেই বা না কেন? সামাদ মিয়ার সকল কাজের সাথী তার বউ। বাড়ির সকল কাজ সে একা করে। তবে কিছুদিন ধরে জ্বর আসায় কাজটাজ অত করতে পারছে না। রান্না করাও তো এখন অত কঠিন কাজ নয়। রাইজ কুকারে ভাত বসিয়ে দিয়ে প্রেশার কুকারে নিজেই যেকোনো একটা তরকারি রান্না করে ফেলে।
ছেলেটা আবার একটু পরে স্কুলে যাবে। তাই আগেভাগে কোনমতে রান্নার কাজটা সেরে নিয়ে ছেলেকে স্কুলে পাঠিয়ে দিল। নিজের তো আর বসে থাকলে চলবে না। দোকানে বসার দরকার ছিল। কিন্তু সামাদ মিয়া এই অসুস্থ বউকে রেখে যায় কিভাবে?

পাশের বাড়ির করিম কাকার বউকে একটু বলে যাওয়া দরকার। সামাদ মিয়া করিম কাকার বউকে ডেকে বলল, আমি একটু দোকানে যাব। রিফাতের মাকে একটু দেখতে পারবে?
- বলিস কিরে ও যে আমার মেয়ের মতন। ওকে দেখতে পারব না কেন?
- তোমার কথা শুনে একটু ভরসা পেলাম কাকি!
- তুই যা! আমি ওর খেয়াল রাখব।

সামাদ মিয়া নিশ্চিন্ত মনে কিছু খেয়েদেয়ে বউয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল। আবার আসবে বিকালের দিকে।

সামাদ মিয়ার অনেক বড় দোকান। নিজের তিনটা দোকান। একটাতে নিজে বসেন আর বাকি দুইটা ভাড়া দেওয়া। আল্লার রহমতে ইদানীং তার ব্যাবসা খুব ভাল চলছে। দোকান খোলার সাথে সাথে তার কাস্টমারের অভাব হয় না। বাকি দুইটা দোকানের ক্ষেত্রেও সেই একই অবস্থা। সেদিক দিয়ে তার মত খুব ভালোই।
তবে রীমাকে একটা ভালো ডাক্তার দেখানোর দরকার ছিল। অনেক দিন ধরে জ্বর। সাধারন জ্বর হলে তো এমনিতেই এতদিনে কমে যাওয়ার কথা। কিন্তু এখনো কমছে না কেন?

সারাদিন অনেক বেচাকেনা হচ্ছে। বেচাকেনার হিসাবের কারনে রীমাকে একরকমের ভুলেই গেল। বিকালের মধ্যে প্রায় সাত আট হাজার টাকার মত মাল বিক্রি হয়ে গেছে। যদিও এটা আজকে নতুন না। অনেক সময় আছে যখন প্রতিদিন বিশ হাজার টাকার উপরেও মাল বিক্রি হয়। সামাদ মিয়া ভেবেছে কালকের মধ্যে রীমাকে একটা ভালো কোন ডাক্তার দেখাবে।
বিকালে দোকানে বসে বসে এই কথাই ভাবছে সামাদ মিয়া।

তখন তার একজন ভালো বন্ধু দোকানের কাছে এসে পাশে থাকা একটা চেয়ারে বসল। সামাদ মিয়া বলল, কি খবর ইদ্রিস?
ইদ্রিস ফোস করে নিশ্বাস ছেড়ে বলল, আর খবর!
- কেন রে! কি হয়েছে?
- আর বলিস না। তোর ভাবি বলেছে আজকে বাজার করতে না পারলে নাকি বাপের বাড়ি চলে যাবে।
- এ আবার কেমন কথা! বাজার করবিনা কেন? বাজার না করলে খাবি কি? বউ যাবে না তো তোকে নাচ দেখাবে?
- কথাটা তো সেরকম না বন্ধু। বাজার যে করব, পকেটে একটা পয়সাও নেই। কি দিয়ে বাজার করব?
- ও।
- তুই মনে হয় ভাবছিস তোর কাছে আমি টাকা চাইতে এসেছি। তা যদি ভেবে থাকিস তাহলে ভুল ভাবছিস। তোর কাছ থেকে অনেক টাকা নিয়েছি আমি। এখন আর টাকা নিয়ে লজ্জায় পড়তে চাই না।
- না সেরকম না। লাগলে কিছু টাকা নিয়ে যা।
- দিতেই যখন চাইছিস তাহলে কিছু দে না!
সামাদ মিয়া তার হাতে পাঁচশ টাকার একটা নোট দিয়ে বলল, "এটা দিয়ে বাজার করগে যাহ্!" নিজের বন্ধু বলে কথা।
ইদ্রিস টাকাটা হাতে নিয়ে খুশি হয়ে বলল, "তোকে ধন্যবাদ!" কথাটা বলেই হন হন করে দোকান থেকে বের হয়ে গেল ইদ্রিস।
সামাদ মিয়া ইদ্রিসের দিকে তাকিয়ে বলল, হতচ্ছাড়ার লজ্জা হবে না জীবনে।

সামাদ মিয়ার ফোনে কে যেন একজন ফোন করল। ফোনটা রিসিভ করে কানে ধরলে ওপাশ থেকে একধরনের কান্নার আওয়াজ শুনতে পেল সামাদ মিয়া। কাকি ফোন করেছে। ওপাশ থেকে কাকি বলল, তারাতারি একটা গাড়ি নিয়ে আয়। তোর বউ যানি কেমন করছে।
কাকির ভয়মাখা কথাটা শুনে তার কেমন যে লাগতে লাগল। মনে হচ্ছে নিজেও তার বউয়ের মত অসুস্থ হয়ে যাবে।

দোকানের আশেপাশে গাড়ির অভাব নেই। একটা সিএনজি ডাক দিল সে। দোকানটা বন্ধ করে

আর এক মূহুর্ত দেরি না করে সিএনজি নিয়ে বাড়িতে চলে গেল।

সামাদ মিয়া বাড়িতে গিয়ে দেখল তার বউয়ের জ্ঞান হাড়িয়েছে। সকালবেলায়ও যার শরির আগুনের মত গরম ছিল সেই শরিরে হাত দিয়ে সামাদ মিয়া দেখল তা বরফের মত ঠান্ডা হয়ে গেছে।
আশেপাশ থেকে লোকজন জড় হয়ে গেছে। কয়েকজন হাত-পা টিপে দিতে বলল।
কাকি হাত-পা টিপতে আরাম্ব করল। তারপর কয়েকজন ধরে রীমাকে সিএনজিতে নিয়ে গিয়ে বসাল। গন্তব্য হাসপাতালের দিকে।

এখান থেকে হাসপাতাল বেশি দূরে না থাকলেও রীমার অবস্থা আরো খারাপের দিকে যাচ্ছে। জ্ঞান নেই তার। হাসপাতালে কিছুক্ষনের মধ্যেই পৌছে গেল। নার্সেরা দ্রুত ইমার্জেন্সিতে নিয়ে গেল। এখন শুধু অপেক্ষার পালা। ভেতরে কি হচ্ছে আল্লাই ভালো যানে।
- আল্লাহ্! আমার বউটাকে ভালো করে দাও।

কিন্তু সেদিন আল্লাহ তার দোয়াটি কবুল করল না। একজন ডাক্তার মাথা নিচু করে সামাদ মিয়ার কাছে এসে বলল, আমরা দুঃখীত! আপনার স্ত্রীকে অনেক চেষ্টা করেও আমরা বাঁচাতে পারি নি। আপনারা অনেক দেরি করে ফেলেছিলেন।

কথাটা শুনে সামাদ মিয়া যেন পাথরের মত শক্ত হয়ে গেল। মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল। প্রকৃতিও যেন তার সাথে তাল মিলিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। একি বলল ডাক্তার সাহেব। সামাদ মিয়া ধপ করে ফ্লোরে পরে গেল।
স্বয়ং ডাক্তার সাহেবই তাকে টেনে নিয়ে ব্রেঞ্চের উপর বসালেন আর বললেন, নিজেকে শক্ত করতে শিখুন। মানুষ মাত্রই মরণশীল। কেউ তো আর সারাজীবন বেঁচে থাকতে পারব না। আমি আপনি সবাই একদিন চলে যাব।
সামাদ মিয়া কান্নারত কন্ঠে বলল, আল্লা আমাকে কেন নিয়ে গেল না!
সামাদ মিয়া আর কিছু মনে করতে পারল না।

যখন জ্ঞান আসল তখন দেখল, তার পাশে তার কাকি বসে আছে। কাকিরও চোখ ভেজা। এতোক্ষনে অনেক মানুষ এসে জড়ো হয়েছে। রীমার বাড়ি থেকেও লোক এসেছে।

বাড়ি থেকে লোক বলতে তার মা আর আর একটা ছোট ভাই। বড় বোনের মারা যাওয়ার খবর শুনে ভাইটি সেখানেই কান্না আরাম্ব করে দিল। বিয়ের আগে তার একমাত্র সংগিই ছিল তার বড় বোন।
নিজের মেয়ের মৃত্যুতে তার মায়ের কান্না করার কথা ছিল। কিন্তু সামাদ মিয়ার মত সেও পাথরের মত হয়ে গেছে। অতিরিক্ত বেশি মায়া থাকলে যেটা হয় আরকি!

স্কুল থেকে ফিরে এসেছে রিফাত। নিজের মা যে মারা গেছে এই কথা সে কোনমতেই বিশ্বাস

করতে পারছে না। এই সেইদিনকার মা, তাকে নিজের হাতে ভাত খাইয়ে দিত, গোসল করিয়ে দিত, যদিও সামান্য একটু জ্বর হয়েছিল। সেরকম জ্বর তো তার নিজেরো মাঝে মাঝে হয়। আবার সেটা এমনি এমনি সেরে যায়। তাই বলে মারা গেল?
রিফাত তার বাবার কাছে গিয়ে বলল, মার কি হয়েছে বাবা?
- সামাদ মিয়া কান্নারত কণ্ঠে বলল, তোমার মা আর তোমাকে মা বলে ডাকবে না।
- তুমি মিথ্যে কথা বলছ কেন বাবা? মা এক্ষনি কেন মারা যাবে? মা বেঁচে আছে।
কান্না করতে করতে নিজের ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন সামাদ মিয়া।

লাস বাড়িতে নিয়ে আসার পর প্রতিবেশিরাও দেখতে আসল। সামাদের বউটা এভাবে জ্বরে মারা যাবে তা গ্রামের কেউ আশা করে নি। আবার অনেকে তো জানেই না যে তার বউয়ের জ্বর হয়েছে। তারা তার আচমকা মৃত্যুর খবর শুনে হকচকিয়ে গেল। সেদিন রাতের বেলা-ই সামাদের বউকে কবর দেওয়া হল। রিফাতের এখন বিশ্বাস হল যে তার মা আর পৃথিবীতে নেই। এখন তাকে কে খায়িয়ে দেবে? কে সন্ধ্যাবেলা পড়তে বসাবে? বুকের মধ্যে আকাশ পরিমান শুন্যতা অনুভব হল যেন ছেলেটার।

সামাদ মিয়া কি করবে ছেলেকে নিয়ে। নিজের খেতে ইচ্ছে করছেনা বলেই তো আর তার ছেলেকে না খিলিয়ে রাখা যাবে না।
সামাদ মিয়া বলল, যাও বাবা! তোমার দাদুর ঘড় থেকে কয়টা ভাত খেয়ে আস।
তবে ছেলে যেতে নারাজ। বলে, তুমিও আস।
- আমার ক্ষিদে নেই।
- আমারো খেতে ইচ্ছে করছে না বাবা।
- না খেলে যে শরির খারাপ করবে।
- তাও আমি খাব না।
ছেলেকে আর জোর করল না সামাদ মিয়া।

কিন্তু এভাবে আর কয়দিন। নিজের ব্যাবসা সামলানো। সেটা তো আর সহজ কথা নয়। যারা ব্যাবসা করে তারাই জানে ব্যাবসা করা কত কঠিন। তার মধ্যে ছেলের দেখাশোনা করা। যদিও কাকি কিছুদিন রান্নবান্না করে দিয়েছে, তাই বলে আর কত দিন? কাকির-ও তো সংসার আছে। সারাজীবন তো আর রান্নাবান্নার কাজ করে দিবে না সে।

তাই একদিন কাকি সামাদ মিয়াকে ডেকে নিয়ে বলল, এভাবে তো আর দিন চলবে না। তোর ছেলে আছে, সংসার আছে, ব্যাবসা আছে। এগুলো তো আর একা সামলাতে পারবি না। ভাবছি তুই একটা বিয়ে করে ফেল।
- সামাদ মিয়া চুপ করে রইল।
- আমি তোর ভালোর জন্যই বলছি। আমার কথা ভেবে দেখিস।
সামাদ মিয়া হালকা গলায় বলল, দেখব।

ঘড়ে এসে সামাদ মিয়া ভাবতে লাগল, আবার কি সে বিয়ে করবে? বিয়ে না করলে ছেলেটার কি হবে। নিজেরও তো রান্নাবান্না করার সময় নেই। আর ছেলেকে পরিপাটি করে স্কুলে পাঠানোও তার পক্ষে সম্ভব না।

কিন্তু এখন তাকে কে বিয়ে করবে? বয়স-ও তো কম হয় নি। পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। এই বয়সে কি ভালো পাত্রী খুজে যাওয়া যাবে?
তারমধ্যে সে যেন আবার রিফাতের খেয়াল রাখতে পারে। সেই মা কি রিফাতের আগের মায়ের মত আদরযত্ন করতে পারবে? রীমা মারা গেছে প্রায় তিন মাস হয়ে এল। রিফাত তার মায়ের বিচ্ছেদ প্রায় অনেকখানিই ভুলে গেছে। তারপরেও রিফাতের মা মারা যাওয়ায় রিফাত নতুন অনেক কিছু শিখেছে। যেমন, আগে যাকে তিনবেলাই হাত দিয়ে খাইয়ে দিতে হত এখন সেই কিনা নিজের হাত দিয়ে তুলে খাবার খায়। নিজেই স্কুলের জন্য রেডি হতে পারে। নিজেই সাবান মেখে গোছল করতে পারে। কিন্তু তারপরেও যে ছেলেটার মধ্যে একধরনের শূন্যতা কাজ করছে সেটা সামাদ মিয়া বুঝতে পারল।

সাত দিনের মধ্যে সামাদ মিয়ার একটা মহিলাকে পছন্দ হল। মহিলার আগের স্বামী নাকি গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গেছে। একটা ছেলে ছিল সেটাও নাকি কয়েকমাস আগে মারা গেছে। এখন সে প্রায় নিঃস্ব। সে নিজেই বলেছে আমি আপনাকে বিয়ে করতে রাজি।
সেদিন বিকেল বেলায়ই কাজি অফিসে গিয়ে সামাদ মিয়া বিয়ের কাজটি সেরে ফেলে। এবারের বউটার নাম মমতা। সামাদ বিয়ে করেছে শুনে গ্রামের অনেক মানুষ বউকে দেখতে এল। সবাই বলতে লাগল, ভালো একটা বউ পেয়েছিস এবার।

সবাই বউটার খুব প্রশংসা করল। তবে রিফাত সেই বউটা মানে তার নতুন মায়ের সামনে যাওয়ার সাহস পাচ্ছে না। নিজের বাবাকে এভাবে অন্য মেয়ের সাথে, ভালো লাগছে না, মোটেও পছন্দ হয় নি তার এটা।
ঘড়ের মধ্যে অনেক ভিড়। তখন সামাদ মিয়ার তার ছেলের কথা মনে হল। মমতাকে আস্তে আস্তে বলল, আমার ছেলেটাকে তো দেখতে পাচ্ছিনা, গেল কোথায়?
সামাদ মিয়া দেখতে পেল দরজার পাশের এক কোনায় চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে রিফাত।
- রিফাত! বাবা, তোমার নতুন মার সাথে কথা বলবে না?
সামাদ মিয়ার কথা শুনে রিফাতের কোন পরিবর্তন হল না। সেখানেই ঠায় দাঁড়িয়ে রইল।
- কি হল! আসছ না কেন?
তারপরেও রিফাত কোন কথা বলল না। বরং দৌড় দিয়ে ঘড় থেকে বের হয়ে গেল।
সামাদ মিয়া ভাবতে লাগল, তারমানে কি মমতাকে রিফাতের পছন্দ হয় নি? বিয়ে করে কি বরং সে ভুল কাজ করল?
নাহ্! এসব ভাবা ঠিক নয়। একটা অচেনা মেয়ে ঘড়ে এসেছে সেটা তো ছেলেটার কাছে লজ্জার ব্যাপারো হতে পারে। কিছুদিন পরে হয়তো সব ঠিক হয়ে যাবে।

সবাই যখন এক এক করে চলে গেল তখন রিফাত দরজার মধ্যে উঁকি দিল। সামাদ মিয়া

ব্যাপারটা দেখতে পেয়ে দরজার কাছ থেকে রিফাতকে ধরে কোলে নিয়ে ঘড়ে আসল। যদিও রিফাত কোন পতিক্রিয়া করল না। তবে নতুন মায়ের সামনে যেতে যে লজ্জা করছে সেটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে।
সামাদ মিয়া তার ছেলেকে বলল, তোমার মায়ের সাথে কথা বলবে না?
ছেলে মনে হয় কথার উত্তর খুঁজে পেল না। হ্যা বলাটাও তার কাছে লজ্জার আর না বলাটাও বেয়াদবির পরিচয়।
রিফাত তার বাবার কাধে মুখ লুকিয়ে ফেলল। মমতা রিফাতকে হাত দিয়ে ইশারা করে কাছে আসতে বলল। সামাদ মিয়া মমতার কাছে এগিয়ে গেল। কিন্তু রিফাত কাছে যেতে নারাজ। বাবার কোল থেকে কোনমতেই নামছে না।

সামাদ মিয়া বিয়ে করেছে অনেক দিন হয়েছে। নিজের প্রাক্তন স্ত্রীকে এতদিনে ভুলে যেতে সক্ষম হয়েছে সে। কেউ মারা গেলে আর কয়দিনই বা তার কথা মনে থাকে। রিফাতও তার আসল মায়ের কথা প্রায় ভুলেই গেছে।
কিন্তু নতুন মাকে সে এখনো আপন করে নিতে পারে নি। তার মধ্যে কি যেন একটা কাজ করছে, ভয়? নাকি লজ্জা?
তবে মমতার সাথে যে রিফাত এক্কেবারে কথাই বলেনা তা নয়। বলে। তবে সেটা খুব কম। আগে রীমার কাছে রিফাত অনেক আবদার করত। দোকানে খাওয়ার জন্য টাকা চাইত। স্কুলে ঝগড়া হলে তার কাছে এসে বিচার দিত। এখন ওসব নিয়ে কোন কথা হয় না।

যতক্ষন স্কুলে থাকে ভালোই থাকে। তবে বাড়িতে আসলেই কেমন যেন মনমরা হয়ে যায়। মমতা তাকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেছে, তবে রিফাতের কোন পরিবর্তন হয় নি। সে মমতার হাতের খাবার খেতে চায় না। মমতার রান্না ভালো লাগে না। সেজন্য সামাদ মিয়াও অনেক চিন্তায় আছে। কি হল ছেলেটার?
তাই নিজেই সে একদিন তার ছেলেকে বলল, এভাবে আর কতদিন তোর মায়ের কথা মনে করে মনমরা হয়ে থাকবি? যে চলে গেছে সে তো আর ফিরে আসবে না। এখন যা কিছু আছে তাই নিয়েই চলতে হবে। নতুন মা তো তোকে আর কম আদর করে না। শুধু তোর জন্যই আমি আবার বিয়ে করেছি। নাহয় কিসের দরকার ছিল আমার বিয়ে করার?
হ্যা! আমি মানি তুই তোর আগের মাকে অনেক ভালোবাসতি। তাই বলে নতুন মায়ের সাথে কেন কথা বলিস না?
সেই সময় মমতা এসে রিফাতকে কোলে তুলে নিল। অন্য সময় থাকলে রিফাত নেমে যাওয়ার চেষ্টা করত। কিন্তু আজকে তা করল না।

মমতা রিফাতকে কোলে তুলে নিয়ে সামাদ মিয়াকে বলল, ওর সাথে কেন এমন করছ? ও এখনো ছোট। হয়তো আমি ঠিকভাবে ওর আপন হতে পারিনি। সেটা আমার ভুল। ওর কি দোষ?

মমতার কথা শুনে সামাদ মিয়া তখন বাড়ি থেকে বের হয়ে গেল। সে বাড়ি থেকে যাওয়ার পর মমতা রিফাতকে বলল, আচ্ছা! আমাকে কি তোমার ভালো লাগে না?
রিফাত মাথা নীচু করে বলল, লাগে।
- মাথা নিচু করে কেন কথা বলছ? আমার দিকে তাকিয়ে কথা বল।
রিফাত একটু সময়ের জন্য মমতার মুখের দিকে তাকাল, কিন্তু সাথে সাথেই সে আবার মুখ সরিয়ে নিল। সেই মুখের দিকে তাকাতে তার লজ্জা লাগে।
মমতা বলল, তাহলে আমার সাথে কথা বলতে চাওনা কেন?
- বলিতো!
- মোটেও না। তুমি কি আগের আম্মুর সাথেও এভাবে কম কথা বলতে?
রিফাত এইবার আর কোন কথা বলতে পারল না।
- আচ্ছা! আমাকে একবার আম্মু বলে ডাক দিবে? তোমার মুখ থেকে এখনো আমি আম্মা ডাক শুনিনি।

রিফাত তার কথার কি জবাব দিবে তা বুঝে উঠতে পারল না। সেই মূহুর্তেই কোল থেকে নামার জন্য উতলা হয়ে গেল। তবে মমতাও কম নয়। রিফাতকে বুকের সাথে জাপটে ধরে আটকিয়ে রাখল। যেন ছুটে যেতে না পারে। মমতা বলল, একবার আমাকে মা বলো না! তোমার মুখ থেকে মা ডাক শুনতে খুব ইচ্ছা করছে।
রিফাত তারপরেও চুপ করে রইল।
- যদি না বল তাহলে বুঝে নেব তুমি আমাকে পছন্দ কর না।
রিফাত ভাবল, এই মূহুর্তে তাকে মা ডাকা ছাড়া উপায় নেই। তাই মাথা নিচু করে একবার তাকে বলল, আম্মা।
মমতার মুখ তখন খুশিতে ভরে উঠল। খুশিতে মমতা রিফাতের গালে একটা গভীর চুমু একে দিল। তারপর স্ব-ইচ্ছায় রিফাতকে কোল থেকে নামিয়ে দিল। রিফাত দৌড়ে ঘড় থেকে বের হয়ে গেল।

সামাদ মিয়া এখন দোকানে বসেছে। দুপুরবেলার এই সময়টাতে দোকানে খদ্দর বেশি আসে না। টিফিন বাটিতে বাড়ি থেকে সকালে ভাত আনে। সামাদ মিয়া ভাবল তা এখনি খেয়ে নিলে ভালো হত। একটু পরেই দোকানে খদ্দর আসা শুরু করবে।
ব্যাগ থেকে টিফিনের বাটিটা বের করবে ঠিক সেই সময় ইদ্রিসের আগমন।

- কি খবর ইদ্রিস?
- আর খবর।
- কেন রে? আবার বউ বাপের বাড়ি চলে গেছে নাকি?
- তুই কখনো ভালো হবি না? আমি তোর দোকানে আসলেই মনে করিস আমার বউয়ের কিছু হয়েছে। এই স্বভাব কবে বাদ দিবি?
- বারে! তোর বউ আমার ভাবি হয়। ওর খবর রাখব না তো আর কার খবর রাখব?

ঠিক সেই সময় ইদ্রিসের চোখ পড়ল সামাদ মিয়ার টিফিন বাক্সের দিকে। ইদ্রিস বলল, কিরে সামাদ? আজকে খাবার কি এনেছিস রে?
- তোকে কেন বলব?
- কেন বললে খেয়ে ফেলব নাকি?
- আমি কি বলেছি? তুই খেয়ে ফেলবি।
- তাহলে বলছিস না কেন?
- আজকে তোর ভাবি আলু দিয়ে তেলাপিয়া মাছ রান্না করেছে।
- মাছের স্মেল আসছে না?
- তুই পাচ্ছিস?
- হ্যা।
- তোর নাক দেখা যায় কুকুরের নাকের মত। আমিই কাছ থেকে গন্ধ পাচ্ছিনা আর তুই নাকি দূর থেকেই তেলাপিয়া মাছের গন্ধ পাচ্ছিস। তা আমার সাথে খাবি নাকি?
- নাহ্! তোর বউ শখ করে রান্না করেছে আর আমি সেটা খাব, কিভাবে হতে পারে বল।
- কি হবে আবার? তুই আমার বন্ধু না? ছোটবেলায় না স্কুলে কত টিফিন ভাগাভাগি করে খেতাম। মনে আছে? একদিন তুই আমার টিফিনের মুরগির রান নিয়ে দৌড় দিয়েছিলি। আবার আরেকদিন যে তুই আমার টিফিনের পরোটা টিফিন পিরিয়ডের আগেই চুরি করে খেয়ে ফেলেছিলি। মনে আছে? তোর ছোট বোনটাও তো আমার কাছ থেকে,,,,,
সামাদ মিয়া ইদ্রিসের দিকে তাকিয়ে অবাক বনে গেল। সে দেখল ইদ্রিসের চোখ ছলছল করছে।
সামাদ মিয়া হেসে বলল, আমি খোঁটা দিচ্ছি বলে তোর রাগ হচ্ছে বোধয়।
ইদ্রিসের চোখের একফোঁটা পানি গাল দিয়ে গড়াতে লাগল। সে সেটা হাত দিয়ে মুছে নিয়ে না সূচক মাথা নাড়াল।
- তাহলে?

সামাদ মিয়া কথার জবাবটা পেল না। তার আগেই ইদ্রিস চোখ আর নাকের পানি মুছে দোকান থেকে উঠে চলে গেল।
তখন সামাদ মিয়ার পুরো কথাগুলো মনে পড়ে গেল। নিজের কপালে হাত দিয়ে বলল, নাহ্! এটা কি করলাম। কেন আবার ওকে পুরোনো সৃতি মনে করিয়ে দিলাম?
সামাদ মিয়ার তখন মনে পড়ে গেল সেই দিনের কথা। যেইদিন ইদ্রিসের বড় বোনটি স্কুলে গিয়েছিল। কিন্তু আর ফিরে আসে নি। একসময় রাত হয়ে গেল। সবাই খুজেছিল। সে নিজেও সেদিন সবখানে হন্য হয়ে খুজেছিল। নিজের ছোট বোনের মত আদর করত তাকে। স্কুলেও খবর নিয়ে কোন তথ্য সেদিন পাওয়া গেল না। ইদ্রিসের বাবা মা মেয়ের বিয়োগে সেখানেই কান্না শুরু করে দিল। আর তখন থানাপুলিশ অতটা সহজ ছিল না।

সামাদ মিয়াও সারারাত অনেক খোজাখুজি করেছে। ইদ্রিসের বোন তো কোথাও একলা যাওয়ার মেয়ে না। সে তো আর বাবা-মাকে না বলে কোন আত্বীয় বাড়ি চলে যায় নি।

তারপরেও কোন পরিচিত অপরিচিত বাড়ি খোজা বাদ রইল না। কিন্তু....সে রাতে মেয়েটাকে পাওয়া গেল না।
রাত পার হয়ে ভোর হয়ে গেল। ভোর পার হয়ে সকাল হয়ে গেল। সেরাতে কারো চোখে ঘুমের একটু চিহ্নও হয় নি। সকাল বেলা সবাই খোঁজা বাদ দিয়ে যার যার কাজে চলে গেল। সামাদ মিয়া আসতে পারল না। ছোট্ট ইদ্রিসের ভেজা চোখ সেদিন তাকে আসতে দেয় নি।

আর থেকেই বা কি করবে। কিন্তু আসতেও পারল না। ইদ্রিসের বাবা মা দুজনে এখনো কান্না করছে। কাঁদতে কাঁদতে দুজনের চোখদুটি লাল হয়ে আছে। সামাদ মিয়া তাদের সান্তনা দিয়ে বলল, চিন্তা করবেন না কাকি। রাবেয়ার কিচ্ছু হবে না। আল্লার কাছে দোয়া করুন। রাবেয়া ফিরে আসবে।
কাকি কান্না করতে করতে বলল, আল্লা! আমার মেয়েটাকে তুমি ভিক্ষা দাও। পারলে আমাকে নিয়ে যাও!

সেদিনও রাবেয়াকে পাওয়া গেল না। আবার সন্ধ্যা নেমে আসল। সামাদ মিয়াও তাদের নিজেদের বাড়ি চলে আসল। রাতটা কোনরকম কাটল। কিন্তু তারপরের দিন যা ঘটল তা শুনে সামাদ মিয়ার মাথায় যেন বিশাল একটা বাজ পড়ল। গ্রামের ছোট ছেলেটি সামাদ মিয়ার কাছে এসে বলল, সামাদ ভাই! সামাদ ভাই! খালের পাড়ের বড় বিরিজটার নিচে রাবেয়ার লাশ পাওয়া গেছে।
কথাটা শুনে যেন মনে হল মাথা ঘুরে সে এক্ষনি পড়ে যাবে।
কোনমতে দৌড়ে খালপারে গিয়ে দেখল সেখানে অনেক ভিড় জমে আছে।
সামাদ মিয়া ছেলেটাকে বলল, কোথায়?
- ওওই নিচে। আ আমি যেতে পারছি না ভাই। ভয় করছে।
- তুই তাহলে এখানেই থাক। আমি গিয়ে দেখে আসি।

দূরে রাবেয়ার মার কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে। লাশের পাশে বেশি মানুষ নেই।
রাবেয়ার মা কান্না করতে করতে বলছে, আল্লা আমার দোয়াটা কেন কবুল করলে না আমি কি পাপ করেছিলাম। আমাকে নিয়ে যাও আল্লা। ইদ্রিসও পাশেই হাউমাউ করে কান্না করছে।
সামাদ মিয়া রাবেয়ার লাশের কাছে আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে। লাশটার গায়ে একটা হলুদ রঙের কাপড় জড়ানো। সামাদ মিয়া যতই এগিয়ে যাচ্ছে একটা বোটকা গন্ধ তার নাকে আসছে। এরকম গন্ধ সে আগেও পেয়েছে। বাড়িতে কোন বড় ধরনের প্রাণী মারা গেলে তা পচে যেরকম গন্ধ হয়।

গন্ধটা মারাত্বক রকমের বেড়ে গেছে। কাছে গিয়ে রাবেয়ার মুখের অবস্থা দেখে মনে হল তার পেটের সব কিছু এক্ষনি বের হয়ে যাবে। রাবেয়ার শ্যামলা মুখটা এক্কেবারে যেন সাদা হয়ে গেছে। মুখের উপরে মাছি ভনভন করছে। এরকম দৃশ্য সে আজকে প্রথম দেখল।
সামাদের বুকটা ধকধক করছে। কপালের একপাশে রক্ত জমাট বেধে কালো হয়ে গেছে। এই গন্ধের মধ্যে আর এক মূহুর্ত থাকতে পারল না। চলে আসার আগে তার চোখে পড়ল পাঁচ ছয়

হাত দূরে রাবেয়ার নতুন স্কুল ড্রেসের পায়জামার দিকে। পাশেই পড়ে আছে বইভর্তি একটা স্কুলব্যাগ। সেটাও রাবেয়ারই।

রাবেয়ার মা উপরের দিকে তাকিয়া চিৎকার দিয়ে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করতে লাগল, আল্লা! যে আমার মেয়ের এই অবস্থা করেছে। সেই জানোয়ারের বাচ্চার যেন কঠিন বিচার হয়। যে আমার নিস্পাপ মেয়েকে এভাবে কলঙ্কিনী করেছে। আমার অভিশাপ রইলো। তুই রক্ষা পাবি না। রাবেয়ার মা কান্না করতে করতে সেখানেই বসে পড়ল।
এভাবে একজন বা কয়েকজন মানুষরুপি পশুর জন্য গোট একটা জীবন ও তার ভবিষ্যৎ পৃথিবী থেকে চিরতরে মুছে গেল।
বড় বোন মারা যাওয়ার কষ্টে ইদ্রিস প্রায় ভেঙ্গেই পরেছিল। তবে কতদিনই বা সেই কষ্ট আর মনে থাকে। কেউ মারা যাওয়ার সাত আট দিন পরেই সবাই তার কথা ভুলে যায়। ইদ্রিসের ক্ষেত্রেও তাই হতে পারত। কিন্তু সেটা হল না।

ধর্ষিতার অপরাধের ছায়া তাদের পরিবারের উপরেও পতিত হয়। সমাজের মুখে তাদের মেয়ে একটা ধর্ষিতা। স্বভাবতই তাদের এই নিয়ে অনেক কথা শুনতে হচ্ছে। যেমন তেমন কথা না। কথাগুলো তাদের তীরের মত কানে এসে বাজে। কান ছিন্যবিচ্ছিন্য হয়ে যায়। বিশেষ করে রাবেয়ার মায়ের। মহিলারা এমনিতেই কানাকানি স্বভাবের হয়। একটা কথা উঠলে সেটা জলতরঙ্গের মত আশেপাশে ছড়িয়ে যায়।
রাবেয়ার মা সেই কথাগুলো হয়তো সহ্য করতে পারে নি। মেয়েটা এমনিতে বেঁচে নেই। আবার মেয়ের নামে এরকম কথা কেমন শোনায় সেটা একমাত্র মায়েরাই জানে।
পুকুরঘাটে পানি আনতে গিয়ে এক মহিলার মুখে সেরকম একটা কথা শুনে তার গায়ের লোম দাঁড়িয়ে গেল।
- ওইযে আসছে! নিজেও এক মা*গী আছিল। অবলা মেয়েটাকেও শেষমেশ আরেক মা*গী বানিয়ে কবরে পাঠাল। সমাজটাকে কালো বানিয়ে দিল। হে আল্লা এদের যে কি হবে? তুমি বিচার কোরো।

সে রাতেই মারা গেল ইদ্রিসের মা। হয়তো অতিরিক্ত চিন্তার কারনে মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ। নয়তো অন্য কোন কারনে, সেটা যাই হোক।
তবে এই ঝড় গুলো যে ইদ্রিসের উপর দিয়ে যাবেনা তা কি করে হয়?
মা আর বোনের মৃত্যুর শোকে একটা মানুষের কি অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে তা আর বলা লাগবে না।

ঠিক এই কথাগুলো আজকে হয়তো মনে পড়ে গেল ইদ্রিসের। মনে মনে চিন্তা করল তার সামনে আর তার মা আর বোনের কথা আলাপ করবে না।

ইদ্রিসের বাপটাও বেশি ভালো না। কিছুদিন শুনল সে আবার নাকি বিয়ে করেছে। এই কিছুদিন আগে একটা শান্তশিষ্ট মেয়েকে বিয়ে করেছে ইদ্রিস। প্রেম করেই।

সামাদ মিয়া এখনো এই ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না যে একটা পাগল প্রায় ছেলেকে এরকম একটা সুন্দরী মেয়ের কিভাবে পছন্দ হল?

এতোক্ষন পরে তার খাবারের কথা মনে হল। ভাত ঠান্ডা হয়ে গেছে। টিফিনের বাক্সটা হালকাভাবে খুলল সে। এক বাটিতে ভাত রাখা আর তার উপরের বাটিতে তেলাপিয়া মাছের তরকারি। ইদ্রিসের কথাই ঠিক। বাসনাটা আসলেই চমৎকার।
বোতলের পানি দিয়ে হাত ধুয়ে নিয়ে আর কিছু পানি নিজে খেয়ে নিয়ে ভাতের সাথে তরকারি হালকা করে মিশিয়ে নিল।
আহ্! দারুন। এই তরকারিটার কাছে অমৃত যেন কিছুই না। সামাদ মিয়া খাচ্ছে আর তার স্ত্রীর রান্নার প্রসংশা করছে।
মাছগুলো সে নিজেই কিনেছিল। অনেকদিন পরে বাজারে ভালো কয়েকটা মাছ উঠেছিল বলে সেগুলোই নিয়ে এসেছে।

আজকে ইদ্রিসের জন্য বেশি দেরি হয়ে গেল। একটু পরেই দোকানে লোক আসা শুরু করবে। সামাদ মিয়া একটু তারাতারিই খেতে লাগল। খাচ্ছে তো খাচ্ছেই। সামাদ মিয়ার সর্দি লাগবে নাকি? গলাটা কেমন যানি চেপে আসছে। কিছুদিন ধরে আবার ঘুমটাও বেশি আসছে না।

খাওয়া প্রায় শেষের দিকে। মাছের পেটিটা আগেই খাওয়া শেষ হয়েছে। শুধু কিছু তরকারি বাকি আছে। সেগুলো দিয়েই বাকিটা খেতে হবে।
বাকি ভাত মাখানোর সময় কেমন যানি সামাদ মিয়ার অস্থির অস্থির অনুভব হতে লাগল। মাথাটা ঝিনঝিনিয়ে উঠল।
ভাত মাখানোর সময় ভাতের এক্কেবারে তলায় কি যেন একটা হাতে বাজল। প্রথমে সেটা তেজপাতা মনে হলেও পরে দেখা গেল সেটা একটা ছেড়া কাগজের টুকরা। ঝোলে সেটা ভিজে গেছে। কাগজটা ফেলে দিতে গিয়েই চোখে পড়ল কাগজের মধ্যে মমতার হাতের লেখা। হ্যা। এটা মমতার হাতের লেখাই। রিফাতকে পড়ানোর সময় দেখেছে মমতার হাতের লেখা কেমন।
কাগজের মধ্যে লেখা, "আমাকে মাফ করে দিও। শুধু টাকার লোভেই আমি তোমাকে বিয়ে করেছিলাম। তুমি মারা গেলেই আমি তোমার সম্পত্তির ভাগ পাব।"

সামাদ মিয়া ভয় পেয়ে নিজের গলায় হাত দিল। এটা কি আসলেই সত্যি? কয়েকটা টাকা আর কিছু সম্পত্তির লোভে নিজের স্বামীকেই বিষ খিলিয়ে মেরে ফেলল? কি দরকার ছিল মারার? চাইলেই তো তার স্ত্রীর নামে নিজের সব সম্পত্তি লিখে দিতে পারত। তাহলে এমন কেন করল মমতা?
নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে তার। মনে হচ্ছে কেউ যেন জোড়ে গলাটা টিপে ধরেছে। পাশে রাখা বোটলটা থেকে পানি খাওয়ার জন্য সেদিকে হাত বাড়াল। কিন্তু একি? তার হাতযে ঠিকমত চলছে না! কোনরকম হাতটা পানির বোতলের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতেই অসাবধানতায় বোটলটা উলটো হয়ে পরে গেল। বোতলের অনেকটুকু পানি নিচে পড়ে পুরো দোকান ছড়িয়ে

যাচ্ছে। তবে সেদিকে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই সামাদ মিয়ার। আস্তে আস্তে পুরো শরীর দুর্বল হয়ে যাচ্ছে তার। একসময় সে আর তার ব্যাল্যান্স না রাখতে পেরে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। গলাটা যেন আরো জোরে কেউ টিপে ধরেছে। মাথার ঝিমঝিম যেন আস্তে আস্তে আরো বেড়ে যাচ্ছে। হাতে কোন শক্তি পাচ্ছে না। এই সময়টাতে কেউ যে তাকে লক্ষ করবে সেই লোকও আশেপাশে নেই।
কিন্তু তার গলা দিয়ে তো কথা বের হচ্ছে না। আওয়াজ করবে কিভাবে।
তার স্ত্রী তার সাথে এমন কাজ করতে পারল? বিষ খেয়ে মারা যাওয়াটা তো দেখা যায় অনেক কষ্টের।
সামাদ মিয়ার কাপড় ফ্লোরে পড়া পানিতে ভিজে যাচ্ছে। শরিরটা ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছে। কষ্টে হাত -পা ছুড়তে লাগল। জানটা মনে হয় এখন চলে যাবে তার। সে বুঝতে পারছে এখন সে মারা যাবে। ভয় করছে তার। মরার পর তার সাথে কি হবে? পৃথিবী ছেড়ে তো সারা জীবনের জন্য চলে যেতে হবে। রিফাতের কি হবে? টাকাপয়সা নিয়ে কি মমতা বাড়ি থেকে চলে যাবে? রিফাতকে কি আর আদর করবে না? তাহলে এতিম ছেলেটার আপন বলতে আর কেও থাকল না?
চোখের এক কোনায় পানি চলে আসল তার। নিজেকেও এখন নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে।

গায়ের শক্তি আস্তে আস্তে কমে আসছে। আর শ্বাস নিতে পারছে না। ফুসফুস বন্ধ হয়ে গেছে। এই শ্বাস বন্ধ হয়েই এখন সে মরে যাবে। আর একটু কল্পনা করার যদি সময় হত? কিন্তু প্রকৃতি তা দিল না।

হ্যা। এক্ষনি সে মারা যাবে। জীবনের সব কিছু এখন এই মূহুর্তেই শেষ হয়ে যাবে। শ্বাস সে নিতে পারছে, তবে বাতাসে মনে হয় অক্সিজেনের পরিমান শূন্য হয়ে গেছে। নিজের এখন চিৎকার করতে ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু শরীরের সব শক্তি যেন ভ্যানিশ হয়ে গেছে। কষ্ট হচ্ছে। খুব কষ্ট হচ্ছে তার। দৃষ্টি আস্তে আস্তে অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে।
৫ ৪ ৩ ২,,,, সময় যেন ফুরিয়ে যাচ্ছে।

ঠিক এই সময় সবকিছু যেন হালকা লাগতে লাগল তার। জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে লাগল। গা ভিজে গেছে। নিশ্বাস তাহলে চালু হল! আমি কি তাহলে মরে গেলাম? কথাটা বলে উঠল সামাদ।

কথাটা মনে করে আশেপাশের দিকে তাকাল সামাদ। নাহ্! সব কিছুই তো ঠিক আছে। ধরাম করে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে পড়ল সামাদ। ঘামে তার পুরো শরির ভিজে গেছে। তারমানে এতক্ষন যাবৎ সে যা কিছু দেখল তা সবকিছু সপ্নে দেখল?
আরাফাত, মায়া, সামাদ সাহেব, সামাদ মিয়া, রীমা, রিফাত, ইদ্রিস, মমতা এগুলো? এগুলো সব তার নিজের দেখা স্বপ্ন?
নিজেই অবাক হয়ে গেল। এত্তো বড় স্বপ্ন সে এর আগে কখনো দেখে নি।
বালিশের পাশে রাখা মোবাইলটার টর্চ জ্বালালো সে। তার খালি গায়ের দিকে তাকিয়ে দেখল

ঘামের শ্রোত বয়ে গেছে। বিছানার চাদরটাও ঘামে ভিজে একাকার। মোবাইলের ঘড়িতে সময় এখন আড়াইটা। রাতের এখনো অনেক বাকি আছে। ঘুম যেন চোখ থেকে দৌড়ে পালিয়ে গেছে।

বিছানা থেকে উঠে পড়ল সামাদ। এই বিছানায় আর ঘুমাতে পারল না সে। ভালোই গরম পরেছে। একটু ছাদে যেতে পারলে মনে হয় ভালো লাগল। ঘড়ের লাইটটা জ্বালিয়ে দিল সামাদ। ছাদে যাওয়ার দরজাটা খুলে সে সিড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল। উপরে উঠে সে সম্পুর্ণ ভিন্ন একটা পরিবেশ দেখতে পেল। মৃদু বাতাস চালিয়েছে। দক্ষিনের দিকে তাকিয়ে দেখল হালকা হালকা বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আর কিছুক্ষণ পর পর শো শো শব্দে জোরে বাতাস এসে গা শিউরিয়ে দিচ্ছে। ভালোই লাগছে তার। তবে খালি গায়ে আসার কারণে একটু শীত শীত লাগছে। একটা শার্ট গায়ে দিয়ে আসলে একটু ভালো হত।

মোবাইলের রিং বেজে উঠল। রীমা ফোন করেছে। তিন বছর ধরে রীমার সাথে সামাদের রিলেশন চলছে। তা এতো রাতে ফোন দিল কেন রীমা? রীমাও কি তাহলে তার মত ছাদে দাঁড়িয়ে প্রকৃতি দেখছে? হতে পারে।

ফোনটা রিসিভ করল সামাদ।
ওপাশ থেকে জবাব আসল, "কি! ফোন ধরতে এতো দেরি করলে কেন? একটু হলেই তো কল কেঁটে যেত। ঘুমিয়েছিলে নাকি?"
- ঘুমিয়েছিলাম। তবে এখন ছাদে আছি।
- এতো রাতে ছাদে কি করছ? অন্য মেয়ের সাথে আড্ডা দিচ্ছ?
- তুমি শুধু নেগেটিভ চিন্তাভাবনা কর কেন? তাছাড়া আজকে বাইরের আবহাওয়া অনেক সুন্দর। তা তুমি কি করছ?
- আজকে তোমাকে নিয়ে একটা সপ্ন দেখেছি তাই ঘুম ভেঙে তোমার কথা মনে হল। তাই তোমাকে ফোন করলাম।
- সত্যি! তুমি আমাকে আজকে সপ্নে দেখেছ? তারমানে তুমি আজকে সারাদিন আমাকে নিয়ে চিন্তা করেছ।
- হতেও পারে! তাতে কি কোন সমস্যা?
- আজকে তোমাকেও কিন্তু আমি সপ্নে দেখেছি?
- তাই নাকি? তা কি দেখলে তুমি?
সামাদ তার পুরো সপ্নটা প্রথম থেকে মনে করে বলল, "সপ্নে দেখেছি আমার সাথে তোমার বিয়ে হয়েছে। আমরা খুব সুখে আছি।"
- সত্যি বলছ তুমি?
- হুম। আমাদের একটা সন্তান-ও আছে।
- তাই নাকি? তারপর?
তারপরের কথা মনে আসতেই সামাদ আর রীমাকে কথাটা বলতে পারল না। তাই ছামাদ মিথ্যা বলল।

- তারপর ঘুমটা ভেঙে গেলে। সপ্নটা কত সুন্দর ছিল।
- আচ্ছা! আমাকে বিয়ে করবে কবে?
- একটা চাকরির ব্যাবস্থা করে নেই। এই বেকার ছেলে শ্বশুরের কাছে গেলে জুতার বারি খেয়ে চলে আসবে।
- তা সত্য। তা একটা চাকরি যোগার করতে পার না।
- চেষ্টা তো করছি।
- আর কিছুদিন দেরি হলে বাবা আমাকে আরেক জায়গায় বিয়ে দিয়ে দিবে। তখন খুব ভালো হবে! হয়েছে এখন ফোন রাখি। আবার ঘুম আসছে। আমি ঘুমাবো।
- ওকে ঘুমাও। গুড নাইট।
- গুড নাইট।

নিজেকে যেন নিঃস্ব মনে হল এই মূহুর্তে। একটা চাকরির জন্য ভালোবাসার মানুষটা তার হতে পারছে না। দুজনের মাঝখানে একটা দেয়াল, সেটা হল চাকরি। কিন্তু কি আর হবে? এটাই দুনিয়ার নিয়ম।

বাতাসের বেগ আরো বেড়ে গেছে। অন্ধকারে আকাশের কিছু দেখা যাচ্ছে না। তবে একটু দূরেই বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সেই আলোয় দেখা যাচ্ছে দক্ষিণের পুরো আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেছে। আশেপাশের গাছগুলো বাতাসের কারনে উত্তর দিকে হেলে যাচ্ছে।
নাহ্! আর এক মুহূর্ত সেখানে থাকতে পারল না সামাদ। শীতে তার গা পুরো ঠান্ডা হয়ে গেছে। আজকের বাতাসটা খুব ঠান্ডা। শুনেছে এরকম ঠান্ডা বাতাস হলে নাকি বৃষ্টি হয়।

নিজের রুমে চলে গেল সামাদ। গিয়ে একটা গেঞ্জি গায়ে দিল। ঘড়টাও ঠান্ডা হয়ে গেছে। দরজাটা ভালোভাবে আটকে দিল সামাদ। বাইরে এখন মেঘ ডাকছে। আর কিছুক্ষনের মধ্যেই বৃষ্টি চলে আসবে মনে হয়। বৃষ্টি আসলে হয়তো তার আরেকটু ঘুম হবে।

বিছানায় শুয়ে আছে সামাদ। ঘড়িতে তিনটা দশ বাজে। বাইরে প্রচুর বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে তবে তার কোন শব্দ হচ্ছে না।
কখন তার দুচোখে ঘুম চলে এসেছে তা সে নিজেই টের পায় নি।
চোখ খুলে দেখল সকাল সারে আটটা বাজে। ইস আজকে একটু আগে উঠতে চেয়েছিল সামাদ। দশটার সময় তার একটা চাকরির ইন্টারভিউ দিতে যাওয়ার কথা ছিল।
কোনমতে বিছানা থেকে উঠে চোখ কচলাতে কচলাতে বাথরুমে গেল ফ্রেশ হতে। এই দরকারি সময়গুলোতে একটু সময় নিয়ে পরিপাটি না হয়ে গেলে চলে?
- ধুর বাথরুম থেকে তোয়ালেটা গেল কোথায়?
দ্রুত বাথরুম থেকে আবার বের হয়ে বারান্দায় গিয়ে শুকোতে দেওয়া তোয়ালেটা নিয়ে আসতে গেল সামাদ।
এখানেও তার ভাগ্যটা ভালো গেল না। রাতের বৃষ্টিতে গ্রিলে শুকাতে দেওয়া তোয়ালেটা ভিজে চিপচিপে হয়ে আছে। এই মূহুর্তে নিজেকে একজন পাগলাগারদের পাগলের মত মনে হচ্ছে।

মনে হচ্ছে নারিকেলের মত নিজের মাথাটাকে বারি দিয়ে ফাটিয়ে ফেলি।

তোয়ালেটা ভালোমতন চিপে ধৈর্য ধরে আবার বাথরুমে প্রবেশ করল সামাদ।

১৫ মিনিটের মধ্যে কোনরকম রেডি হয়ে গেল সামাদ। নয়টা বাজতে আর মাত্র পাঁচ মিনিট। ইন্টারভিউ দেওয়ার আগে একটু ফিটফাট না হয়ে গেলে চলে? একটু দেরি হলে হোক। সামাদ আয়নার সামনে গিয়ে কালকের ইস্ত্রি করা প্যান্টটা ভালোমতন পড়ে নিল। বেল্টটা ভালোমতন লাগিয়ে সাদা শার্টের উপর কালো কোট গায়ে দিল। শার্টটা সুন্দর করে ইংক করে নিল। ব্যাস! প্রয়োজনীয় ফাইলগুলো নিয়ে রওনা হল সে। এখন ভালোমতন বাস পেলেই হয়। বাসে যেতে আধাঘন্টা লাগতে পারে।

কিছু কিছু দিন যে কি হয়। মনে হয় এই গ্রহে জন্ম নিয়েই ভুল হয়েছে। তারচেয়ে মঙ্গল গ্রহে জন্ম হলেই ভালো হত। দশ মিনিট হয়ে গেছে একটা বাসও আসছে না। রাস্তার বাস কি সব ইস্টক করে মারা গেল নাকি?
যেদিন বাসের দরকার নেই সেদিন কানের গোড় গিয়ে পেপু করতে করতে ছুটে যায় হাজার হাজার বাস।

সুদীর্ঘ পচিঁশ মিনিট পরে একটা বাস পাওয়া গেল। যার মধ্যেও জনবল ঠাসা। কিন্তু কিছু করার নেই। পরক্ষনেই যখন সামাদ বাসে উঠে ভালো একটা পজিশনে চলে গেল। বাসটাও ছেড়ে দিল। ঠিক সেই সময় একটা খালি বাস তাদের বাসকে ওভারটেক করে শা করে ছুটে গেল। সামাদ সেই বাসটার উদ্দেশ্য করে মনে মনে বলল, সালা! এতোক্ষন তুই কোথায় ছিলি?

একটুর জন্য রক্ষা পেয়েছিল সেদিন। অন্তত পাঁচ মিনিট আগে পৌঁছেছিল সামাদ। ইন্টারভিউ ভালোই হয়েছে। তবে বাসে করে আসার সময় ইস্ত্রি করা কাপড়গুলো তেনা তেনা হয়ে গিয়েছিল।

ইন্টারভিউ বোর্ড থেকে বের হয়ে সামাদ মোবাইলটা চালু করল। নিজের ফোনটা বন্ধ করে নিয়েছিল সে। ফোন চালু করার পর দেখতে পেল রীমা অনেকবার ফোন করেছিল। রীমার কি কোন দরকার?
সামাদ রীমাকে ফোন করল।
সামাদ বলল, হ্যালো! কি বল?
- কোথায় তুমি? কতবার ফোন দিলাম। ফোন বন্ধ আছিল কেন?
- কেন তুমি জান না যে আজকে আমার ইন্টারভিউ দিতে যাওয়ার কথা ছিল।
- অহ্! আমার তো মনেই ছিল না। দিয়েছো?
- দিয়েছি।
- ভালো হয়েছে তো?
- ভালোই। তা কি জন্য ফোন দিয়েছিলে তা কিন্তু তুমি এখনো বল নি।

- অহ্! চলনা আজকে একটু কোথাও ঘুড়ে আসি।
- এখন? এই দুপুরবেলা?
- হ্যা।
সামাদ আশেপাশে তাকাল। যদিও দুপুর। তবে মনে হচ্ছে আজকে তার জীবনের প্রিয় একটা দুপুর। রোদ নেই। আকাশে মেঘের ঘনঘটা চলছে। রাতের মত বৃষ্টি আবার আসতে পারে। যেন এমন দিনের অপেক্ষায়ই ছিল সামাদ। তার ইচ্ছে একটা বৃষ্টিময় দিনে তার প্রিয় মানুষটির হাত ধরে অজানা পথ চলবে।
সামাদ বলল, যদি বৃষ্টি আসে?
- ছাতা নিয়ে আসছি তাহলে। তোমার লোকেশনটা পাঠাও। খুজতে সহজ হবে।
- ঠিক আছে। পাঠাচ্ছি।

সামাদ রীমার মেসেঞ্জারে তার লোকেশনটা পাঠিয়ে দিল। পাশের একটা চায়ের দোকানে বসল সামাদ। দুরে গেলে হয়তো রীমা খুজে পাবে না। এখান থেকে রীমাদের বাসা কাছেই। দশ মিনিটের মত লাগতে পারে।
আজকে আশেপাশে মানুষজনের পরিমান খুব কম। আজকের পরিবেশটা কি কারো পছন্দ হয় নি নাকি?

আচ্ছা! এক কাপ চা খেতে পারলে কেমন হয়?
- আংকেল! এক কাপ রঙ চা দিয়েন তো। বেশি করে চিনি দিয়েন।
একটু একটু শীত শীত লাগছে তার। টানা তিন দিন ধরে আবহাওয়া এমন। রোদের কোন দেখাসাক্ষাত নেই। এই একটু ঠান্ডা ঠান্ডা পড়বে। আবার মেঘ এসে বৃষ্টি নামবে। আজকে আসার সময়ই সামাদের একটা ছাতা নিয়ে আসার কথা ছিল। কিন্তু মনে ছিল না।

চা এসে গেল। চায়ে চুমুক দিতেই ভিন্ন একটা অনুভূতি হল তার। মনে হল আশেপাশের পরিবেশ, চা আর মন একজায়গায় পুঞ্জিভূত হল।
আশেপাশের মানুষের পরিমান আরো কমে আসছে। চায়ের দোকান প্রায় খালি। চা-টা আস্তে আস্তেই খাচ্ছে সামাদ। সে জানে রীমার আসতে এখনো অনেক দেরি হবে। বেচারি প্রিয় মানুষটির জন্য হয়তো পছন্দের শাড়ি পড়বে। ভালো না লাগলে হয়তো আবার খুলে ফেলবে। চুল বাধার ক্ষেত্রেও একই নিয়ম। এক স্টাইলে বাধবে আবার পছন্দ হবে না। আবার খুলে ফেলবে। সাজগোজ তো আছেই।
নিশ্চিন্তে চা খাচ্ছিল সামাদ। সেই সময় রীমা রিক্সা থেকে নামল। সামাদ যেন হা হয়ে গেল। এক কারনে না। দুই কারনে। প্রথম কারন হল,
সামাদের সব ধারনা ভুল। এতো আগেই তো আসার কথা ছিল না মেয়েটার। অথচ তার চা কেবল অর্ধেক শেষ হয়েছে। আর দ্বিতীয় কারন হল রীমা কুচকুচে কালো একটা শাড়ি পড়ে এসেছে আজকে। মাথার চুলগুলোও বাধেনি। শুধু চিরুনি দিয়ে সমান করে আঁচড়িয়ে এসেছে। আজকে রীমাকে এই বিনা সাঁজে যেন তাকে......
পরীর মত? নাহ্! পরী বললে ভুল হবে। পরীরাও হয়তো আজকে ওর ওপর ক্রাশ।

রীমা সামাদকে দেখতে পেয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে। রীমা আস্তে আস্তে কাছে আসছে আর তার সুন্দর্য যেন বর্গের সমানুপাতিক হারে বেড়ে যাচ্ছে।

সামাদ হা করে এখনো তাকিয়ে আছে। রীমা অনেক কাছে এসে গেছে। সিল্কের মত চুলগুলো বাতাসে উড়ছে। চোখের নিচে শুধু একটু কাজল। হয়তো সেটা অনেক আগেই দিয়েছে। একটা ছোট্ট কালো টিপ কপালে দিয়েছে।
লাল পরী, নীল পরী, অনেক পরীর নাম শুনেছে সে। কালো পরী যে এত্তো সুন্দর হয় তা সে ভেবেই দেখে নি।
রীমা সামাদের চোখের সামনে হাত নাড়িয়ে সম্মোহন ফিড়াল। সামাদের হুশ ফেরার পর রীমা বলল, চা খাওয়া শেষ কর।
চায়ের কথা মনে ছিল না তার। এতক্ষনে তা ঠান্ডা হয়ে গেছে। দুই ঢোকে বাকি অর্ধেক চা শেষ করল। সামাদ চায়ের দামটা মিটিয়ে দিয়ে রীমাকে বলল কোথায় যাবে আজকে?
- আমাকে ভালো একটা জায়গায় আজকে ঘুড়তে নিয়ে যাও না প্লিজ!
- তুমিই না ইচ্ছে করে আসলে। এখন তুমিই বল কোথায় যাবে।
- চলোনা আজকে নদীর পারে যাই।
- এইসময়? নদীতে গিয়ে তুমি কি করবে। গোছল করবে নাকি?
- আমার ইচ্ছে করছে তাই যাব। সেটা তোমাকে কেন বলব।
- যথা আজ্ঞা মহারানী। চলুন রিক্সায় ওঠা যাক।

দুজনে রিক্সায় উঠল। এর আগেও তারা অনেকবার একই রিক্সায় উঠে অনেকবার ঘুড়ে বেড়িয়েছে। কিচ্ছু হয়নি। তবে আজকে তার কেন এতো লজ্জা করছে?
হটাৎ রীমা সামাদকে জিজ্ঞাস করল, আচ্ছা তোমার প্রিয় রঙ কি?
- প্রিয় রঙ?
সামাদের প্রিয় রঙ কি সেটা সে আগে কখনো ভেবে দেখে নি। কিন্তু রীমাকে তো তার কিছু একটা বলতে হবে। কিন্তু কোন রঙ বলা যায়। তবে এই মূহূর্তে তার প্রিয় রঙ হয়ে উঠেছে "কালো"। তবে এই কথাটা রীমাকে বলতে তার লজ্জা হচ্ছে।

রীমা বলল, কি হল? কথা বলছ না কেন?
সামাদ বলল, আমার অনেকগুলো রঙ পছন্দ। কয়টা বলব?
- সবগুলো বল।
- যেমন ধরোঃ লাল, নীল, সবুজ, সাদা, কালো, আর হ,, হলুদ।
- আমাকে আজকে কেমন লাগছে বলোতো!
আচ্ছা মেয়েটার কি লজ্জাশরম কিছু নাই নাকি। রিকসাওয়ালা লোকটা মুরুব্বি মানুষ। সে এসব শুনতে পারলে কি ভাববে?
সামাদ মুখে আংগুল দিয়ে রীমাকে চুপ করতে বলল। আর কানে কানে বলল, আজকে তোমাকে দারুন লাগছে।

- তা এতো আস্তে কথা বলছ কেন?
সামাদ হাতের ইশারায় রিকসাওয়ালাকে দেখাল। আর ফিস ফিস করে বলল, তিনি আমাদের এইসব কথা শুনে কি ভাববেন!

তখন সামনে থেকে রিকসাওয়ালা বলে উঠল, তোমরা কি কথা বলছ তা মনে হয় আমি শুনতে পাচ্ছিনা তাইনা? পাচ্ছি সব শুনতে পাচ্ছি।

সামাদের মরে যেতে ইচ্ছে হল। এখন কি হবে? লোকটা কি ভাববে?

- তবে চিন্তার কিছু নেই। রিকসা চালানোর সময় অনেক কথাই শুনতে পাই। তোমাদের মত কত লোক উঠে আমার রিক্সায়। কত তাদের ভাব। তাদের কাছে তো তোমরা দুজন কিছুই না। সেদিন দুজন ছেলেমেয়ে একসাথে উঠেছিল আমার রিকসায়। বয়সে তোমাদের চেয়ে দুজনে অনেক ছোট।
উঠেই দুজনে রসের আলাপ শুরু করে দিল। কত সুন্দর মিল দুজনের। একজন নাকি আরেকজনকে ছাড়া বাঁচবেই না। শহিদ হবে আরকি। কথা বলছিস ভালো কথা। একসময় তারা কাছে এসে দুজনে ঠোট দিয়ে যে কি কাজ আরাম্ব করে দিল। বেচারারা হয়তো জানে না যে আমার এই ছোট্ট আয়নায় সব দেখা যাচ্ছিল। তাদের অবস্থা দেখে আমার পা কাঁপতে আরাম্ব করল। ভালোমতন পেডেল করতে পারছিলাম না। কেউ দেখে ফেললে কি হবে? ছেলেমেয়েগুলোর মানসম্মান থাকুক বা নাই থাকুক। তার নিজের তো আছে। নাকি!

সামাদ বলল, তাহলে আপনি আমাদেরটাও আয়নায় দেখে বলেছেন তাইনা?
- হ্যা।
ঠিক তাই। সামাদ রিকশার সামনে লাগানো লুকিং গ্লাসটায় রিকসাওয়ালার মুখ দেখতে পেল।

নদীর ঘাটে দুজনে এসে গেছে। রিকসা থেকে নেমে পড়ল তারা দুজন। নদীর পরিবেশটা আজকে অনেক অন্যরকম লাগছে। পাশেই কয়েকটা কাশফুল গাছ। তবে তাতে কোন ফুল নেই। সেগুলো মনের আনন্দে বাতাসের তালে তালে দুলে যাচ্ছে। নদীর ওই পারে বিশাল ধানের ক্ষেত। বাতাসেরও একটা ছন্দ আছে। ধানের চারাগুলোর উপর বাতাসে ঢেউ খেলছে। সেই ঢেউ আবার অনেক দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

রীমা দৌড়ে নদীর কিনারায় চলে গেল। বাতাসে তার শাড়ি আঁচল পতাকার মত উড়ছে। সামাদ তার পিছনে পিছনে ছুটে গেল।

রীমা সামাদকে অনুরোধ করে বলল, চলনা আজকে দুজনে নৌকায় উঠি!
- এখন?
- চলনা খুব মজা হবে।
- তা নৌকা পাবে কোথায়?

- কেন? ওইযে,,, দেখতে পাচ্ছ না। একটা নৌকা।
সামাদ নৌকার দিকে তাকাল। সে দেখতে পেল একটা লোক নৌকা নদীর তীরের কাছে এনে সেটা বাধঁছে। মাঝি মনে হয়।
সামাদ রীমাকে বলল, চল! গিয়ে কথা বলা যাক।

দুজনে চলল সেই নৌকার দিকে। সেই মাঝি লোকটা নৌকা বাঁধার কাজ শেষ করে এদিকেই আসছে। সামাদ লোকটাকে ডাক দিয়ে বলল, কাকা! ওই নৌকাটা কি আপনার?
- হ। কেন?
- আচ্ছা আপনার নৌকাটা দিয়ে কি আমরা একটু ঘোরাঘুরি করতে পারব।
লোকটা মনে হয় তাদের কথা শুনতে পায়নি। তাই সে বলল, কি কও?
- মানে আমরা কি আপনার নৌকায় উঠতে পারব?
- নৌকায় উঠবার চাও? কৈ যাবা?
- যাবো না কোথাও। এখানেই একটু মানে আরকি ঘোরাঘুরি করব।

- শহর থিকা আইছ তাই না?
- হ্যা কাকা।
- শোনো! দুপুর হইছে। আমি বাড়িত যাইব। আইতে আধ ঘন্টার মত লাগব মোনয়। চাইলে নৌকা চালাইতে পার। তয় খুব সাবধানে বুচ্ছ! স্রোতে কিন্তু মাঝে মাঝে অনেক দূরে নিয়া যায়।
- সেটা ভাববেন না কাকা। আমি নৌকা চালাতে পারি।

নৌকায় উঠলো তারা। বাতাসের অবস্থা বেশি সুবিধার না। বৃষ্টির একটু একটু ফোঁটা পড়ছে। ভাগ্য ভালো নৌকায় ঝাপি আছে। রীমা ঝাপির ভিতরে উঠে বসল। রীমা বলল, কি হল মাঝি সাহেব? নৌকা চালাবে না?
- দাড়াও নৌকার বাঁধনটা খুলছি।

নৌকার বাঁধনটা খুলে ফেলল এক টানে। বৈঠার বিকল্প একটা লম্বা বাঁশ। তবে একটা কাঠের বৈঠা দেখতে পেল সামাদ সেখানে। রীমা বলল, চল ওই পারে যাই।
- ওখানে গিয়ে কি করবে?
- জানিনা। তবে যেতে ইচ্ছে করছে? আচ্ছা ওইযে দেখছনা দূর থেকে একটা শাপলা ফুল ভেসে আসছে। সেটা ধড়তে পারবে না।
- তুমি কি পাগল হয়ে গেলে নাকি? ওখানে তো অনেক দূর। আমরা সেখানে যেতে যেতেই ফুলটা অনেক দূরে চলে যাবে।

সামাদ নৌকার এক মাথায় বসে নৌকা চালাচ্ছে। যাক! ভালোই লাগছে। সেই ছোটবেলায় অনেক নৌকা চালানো হত। মনে হচ্ছে সে আজকে আবার ছোট হয়ে গেছে।

পরিবেশটা ভালোই ছিল। কিন্তু একটু পরেই বাজল এক বিপত্তি। ঝম ঝম করে বৃষ্টি শুরু হয়ে

গেল। সামাদের কাধে একটা ব্যাগ। তার মধ্যে দরকারি সব কাগজপত্র। ভিজে গেলে সর্বনাশ। সামাদ তার ব্যাগটা ঝাপের ভিতরে বসে থাকা রীমার কাছে দিল। কোটটাও খুলে রীমার কাছে দিল।

ভালোই জোরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। রীমা ব্যাগ থেকে একটা ছাতা বের করে সামাদের দিকে ধরল। আর বলল, এই নাও। মাথায় দিয়ে নৌকা চালাও। সামাদ বলল, আমার কি দশটা হাত নাকি? দুই হাত দিয়ে বৈঠা ধরেছি। ছাতা ধরব কোন হাত দিয়ে? রীমা ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বলল, আসলেই তো! সেটা তো ভেবে দেখি নি।

রীমা বলল, তাহলে আমি তোমার কাছে গিয়ে ছাতা ধরব?
- থাক আসা লাগবে না।
- নাহ্! ভিজলে সর্দি লাগবে আমি বরং আসলাম।
কথাটি বলেই রীমা ছাতাটা বুটিয়ে সাবধানে এগিয়ে আসল। এসেই সামাদের বুকে হেলান দিয়ে বসল। সামাদের পুরো শরিরে যেন এক ধরনের বিদ্যুৎ খেলে গেল। রীমা ছাতাটা এমনভাবে ধরল যাতে কারো গায়ে বৃষ্টি না লাগে। তবে মজার ব্যাপার হল বৃষ্টিতে সামাদের ভেজার আর কোন জায়গা বাকি নেই। পুরো কাপরগুলোই ভিজে এক্কেবারে চুপসে গেছে। সামাদের ভেজা শার্টের জন্য রীমার শাড়ির পেছনের অংশ আস্তে আস্তে ভিঁজতে আরাম্ব করেছে। কিন্তু সেদিকে তার কোন ভ্রুক্ষেপ নেই।

বৃষ্টি কমার কোন নামগন্ধ নেই। বৃষ্টি না থামলে মাঝিও আসবে না। এখানেই তাদের বসে থাকতে হবে। সামাদ যে নৌকা চালিয়ে অনেক সুবিধা করছে তা কিন্তু মোটেও নয়। স্রোতের প্রতিকুলে টিকে থাকতেই তার যত চেষ্টা। ওপারে যাওয়ার চেষ্টা তার বৃথা।
সামাদ রীমাকে বলল, নৌকাটা ঘাটে নিয়ে বেঁধে রাখি বরং। এভাবে এই অবস্থায় তো আর নৌকা চালানো যাচ্ছে না আমার। খুব পরিশ্রম হচ্ছে।
- তোমার যেটা ভালো মনে হয় করো তাহলে।

সামাদ আরেকটু বল প্রয়োগ করে নৌকাটিকে ঘাটের কাছে আনার চেষ্টা করল। তবে প্রচুর কষ্ট হচ্ছে তার। যদিও নদীতে স্রোতের বেগ খুব অল্প। অনেকদিন নৌকা না চালানোর কারনে বৈঠা কোন সময় কোন দিকে খোঁজ দিতে হয় তা অনেকটাই ভুলে গেছে। তবে অবশেষে ঘাটের কাছে নৌকা আনতে পারল সামাদ। অতি দ্রুত উঠে গিয়ে পাশের একটা পোতা বাঁশের মধ্যে নৌকার দড়িটা বাধল।
ব্যাস! আর কোন ঝামেলা নেই। দুজনের নৌকার ঝাপের ভেতর চলে যেতে হল। বৃষ্টি শুরু হয়েছে তো হয়েছেই। এই বেলায় মনে হয় না থামবে। এতক্ষন এখানে দুজন কি করবে?

মনে মনে রীমার প্রতি সামাদের অনেকখানি রাগ জন্মাতে লাগল। কেন আসতে গেল মেয়েটা এখানে? মনে করেছিল দিনটা মেঘলা মেঘলাই থাকবে। এভাবে যে বৃষ্টি শুরু হবে তা সে জানে না। জানলে কি সে এখানে আসত?

হয়তো তাও আসত।
খুব যে খারাপ হয়েছে তা কিন্তু মোটেও নয়। দুজনে এরকম নিরিবিলি পরিবেশে সময় কাটানোর জন্য কত না চেষ্টাই করেছে। আজকে হয়তো তাদের সেই সপ্নটা পূরণ হয়েছে। রীমা সামাদকে বলল, তোমার কেমন লাগছে আজকে? সামাদ অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে বলল, ভালোই লাগছে আজকে।
রীমা আবার সামাদের এক্কেবারে কাছে এসে বুকে হেলান দিয়ে বসল। সামাদ ভাবল, আচ্ছা! মেয়েটা এমন কেন। এতো কাছে আসতে চায় কেন? খুব বেশি কি ভালোবাসে তাকে? এই উত্তরটা খুজে পায় না সে। হয়তো সে যা ভাবছে তাই।

রীমা বলল, আজকে কিন্তু শুধু তোমার জন্য আমি অন্যরকমভাবে সেঁজে এসেছি। কেমন লাগছে বল তো?
রীমা কথাটা বলে সামাদের মুখের দিকে তাকাল। সামাদ বলল, দারুন লাগছে তোমাকে।
- সত্যি?
- কেন আমি কি তোমার সাথে মিথ্যে কথা বলি?
- তা মোটেও না।
- তোমাকে আমার সব সময় ভালো লাগে। সাজলেও ভালো লাগে আর না সাজলেও ভালো লাগে।
রীমা সামাদের আরো কাছে চলে আসল। সময় যেন তাদের দ্রুত কেঁটে যাচ্ছে। সময় তিনটা বেঁজে বারো মিনিট। বৃষ্টির পরিমান অনেক্ষানি কমেছে। আকাশের রঙ আবার সাদা হয়ে আসছে। তবে এই বৃষ্টিতেও কেউ ঘড় থেকে বের হবে না। মাঝিও মনে হয় বাড়িতে জব্বর একটা ঘুম দিয়েছে।

ভেঁজা কাপড়ে সামাদের প্রচুর শীত লাগছে। আজকেই হয়তো তার একটা সর্দি বেধে যেতে পারে। মেয়েটার গায়ের উত্তাপের জন্যই একটু যা রক্ষা। তা না হলে এখানেই সে কেঁপে মরত। বৃষ্টি অনেকটাই কমে গেছে। এখন যাওয়া যেতে পারে। মাঝিটাও চলে আসতে পারে। এর আগেই বিদায় হওয়া ভালো হবে। তবে ভেঁজা কাপড়ে বাসায় যেতে হলে তাকে একটু সমস্যায় পড়তেই হবে।

নৌকা থেকে বের হতে হতে সামাদ বলল, তোমার কথায় কেন যে আমি এখানে আসলাম। না কিছু পারলাম দেখতে না কিছু পারলাম খেতে। সেই সকালবেলা না খেয়ে বের হয়েছি। সাড়ে তিনটা বেজে গেল অথচ আমার কিছুই খাওয়া হয় নি। রীমা তখন বলল, তাহলে চল না হোটেলে যাই।
- এই অবস্থায়? এই ভেঁজা কাপড়ে? লোকে কি বলবে? নিজে তো একবারে ফুরফুরে আছো। আর আমাকে দেখো। বাসায় যেতে হবে। ভালোমতন গরম পানি দিয়ে গোছল করে একটা ঘুম দিব। এক ঘুমে রাত কাবার। প্লিজ বাসায় গিয়ে ফোন দিয়ে ঝামেলা করো না।

সামাদ যা মনে করেছিল তার কোনটাই হল না। সে মনে করেছিল ভেঁজা কাপড়ে হয়তো তাকে

দেখে সবাই অবাক হবে। কিন্তু তা হল না। কারণ তারা যে রিকসাটা নিল সেই রিকশাওয়ালা-ও মনে হয় বৃষ্টিতে ভিজেছিল।
চারটা বেঁজে গেছে। কাপড় একটু একটু করে শুকোচ্ছে। এখন লোকে দেখে বুঝতেই পারবে না যে সামাদ ভেঁজা কাপড় পড়ে আছে।
রিকসা থেকে নেমে পড়ল দুজনে। এখন বাসের জন্য অপেক্ষা করতে হবে তাদের। এখানে এখন বাসের অভাব নেই। অথচ আজকে সকালে একটা বাসও পাওয়া যাচ্ছিল না। একটা বাস দাড় করালো তারা। থামল বাসটি। দুজন বাসে উঠে পড়ল। গন্তব্য এখন তাদের বাসার দিকে।

বাসে গল্প হল অনেক। তাদের বিয়ে নিয়ে। বিয়েতে রীমা কোন ধরনের শাড়ি পড়বে, কিভাবে সাজবে, কিভাবে মেহেদী লাগাবে ইত্যাদি ইত্যাদি। সামাদ তার কথাগুলো মনোযোগ দিয়েই শুনছিল। শুনতে ভালোই লাগছিল তার।
রীমা হটাৎ বলল, তুমি চাকরিটা পেয়ে গেলেই আমি বাবার কাছে গিয়ে আমাদের সম্পর্কের কথা বলব। আজকের ইন্টারভিউ তো দিলে। তা চাকরি হবে কি?
- জানিনা।
- কেন?
সামাদ চুপ করে রইল। জানালার গতিশীল গাছের দিকে কিছুক্ষন তাকিয়ে থেকেই সে বলল, জানো রীমা! এখন দুনিয়ায় টাকা ছাড়া কিছুই হয় না। যার টাকা আছে তার সব আছে। আর যাদের টাকা নেই তাদের কিচ্ছু নেই। বন্ধুবান্ধব নেই, আত্বীয় নেই, ভা..... কিচ্ছু নেই। আসল কথা হল তাদের শান্তি নেই।
জানো রীমা! আমার একটা বন্ধু ছিল। ছাত্র বেশি ভালো ছিল না। লেখাপড়ারও বেশি আগ্রহ ছিল না। অন্যের খাতা টুকে কোনমতে ফেল ঠেকিয়ে উপরের শ্রেণিতে উঠেছে। বাপটা অনেক ধনী ছিল, তাই সারাদিন বাপের টাকা উড়াত।

ছোটবেলায় ওকে বলতাম, তোর বাপটা নাহয় ভালো বেতনের চাকরি করে। পড়ালেখা না করলে তুই বড় হয়ে কি করবি? তোর বাপ তো আর সারাজীবন বেঁচে থাকবে না। আমাদের কথায় বন্ধুটা শুধু হাসত, আর বলত পরেরটা পরে দেখা যাবেনি। তুই আমাকে নিয়ে এতো মাথা ঘামানোর কেরে?
সেই বন্ধুটা আজকে অনেক দামী চাকরি করে। নিজের গাড়ি ছাড়া এক কদমও হাঁটে না। সেদিন সকালে আমার সাথে দেখা হয়েছিল।
রাস্তায় বাসের জন্য দাঁড়িয়েছিলাম। তখন আমার সামনে ওর গাড়ি উপস্থিত। আমাকে সামনে এগিয়ে দিতে চাইল। আমি না করলাম না। কতদিন পরে আমার তার সাথে দেখা। জানতে চাইলাম ওর ইতিহাস। খুব ভালো বন্ধু আমরা। খুলে বলল সবকিছু।
"টাকা থাকলে সব হয় রে বন্ধু। টাকার জন্যই আজকে এই চাকরিটা করতে পারছি। অনেক টাকা বেতন। এইজে গাড়িটা দেখতে পাচ্ছিস! নিজের টাকা দিয়ে কিনেছি।", বলল সামাদ।

আরো অনেক গল্প হল। তবে আমি মনে মনে কি ভাবছিলাম যান?
- কি?

- ছোটবেলায় আমরা যার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করতাম, সে আজকে সফল। অথচ আমরাই ব্যার্থ।
রীমার বাস থেকে নেমে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। বাকিটা পথ সামাদের একটা যেতে হবে। তবে বেশি সময় লাগবে না। মাত্র দশ-বারো মিনিট লাগতে পারে।
বাসায় চলে আসল সামাদ। এসেই বাথরুমে ঢুকে গোছলটা সেরে ফেলল। ক্ষুধার জ্বালায় পেটে আগুন জ্বলছে। এখন ভালোয় ভালোয় কিছু খেতে পারলে হয়।

এভাবেই চলতে লাগল সামাদের দিন। আস্তে আস্তে সময় চলে যাচ্ছে। দিন পার হয়ে যায়। সপ্তাহ পার হয়ে যায়। মাস পার হয়ে যায়। রীমার সাথে সম্পর্ক ভালোই চলছে। সমস্যা হল চাকরি। এই নিয়ে যে সে কতবার চাকরির আবেদন করেছে। তার কোন হিসাব নেই। কিন্তু একটা চাকরিও জুটাতে পারছে না। মাঝে মাঝে নিজের মরে যেতে ইচ্ছে হয়।

দেখতে দেখতে এক বছর পার হয়ে গেছে। কয়েকদিন ধরে সামাদ আবার একটু পড়াশুনার দিকে মনোযোগ দিয়েছে। মাঝে মাঝে সে চিন্তা করে চাকরির আশা ছেড়ে দিয়ে একটা ছোটখাটো ব্যাবসা দাঁড় করানোর কথা। কিন্তু তা আর হয়ে উঠে না।
কিছুদিন ধরে সামাদ রীমার সাথেও কথা বলা একটু কমিয়ে দিয়েছে। তার বড় কারণ হচ্ছে এতে তার পড়াশুনার ক্ষতি হয়। যদিও রীমা এই ব্যাপারটা যানে।
রাত ৯ টার সময় সামাদকে ভিডিও কল করতে বলেছিল রীমা। রীমাও মনে হয় নয়টার অপেক্ষায়ই আছে। একসময় ৯ টা বাজল। সাদে গিয়ে সামাদ রীমাকে ফোন করল। সাথে সাথেই ফোনটা রিসিভ করল।
সামাদ বলল, ফোন করার অপেক্ষায় ছিলে বুঝি?
- হাতে ফোন নিয়েই বসেছিলাম, তোমার সাথে কথা বলব বলে।
- তাই নাকি? এতো ভালোবাসো আমায়?
- হুম! বড্ড বেশি ভালোবাসি। তা লেখাপড়ার কি অবস্থা?
- সামনের মাসেই একটা ভালো চাকরির পরিক্ষা আছে। হয়ে গেলেই সোজা বিয়ে।
- হয়েছে হয়েছে, আর বড় বড় কথা বলতে হবে না।

সম্পর্ক ভালোই চলছে তাদের। ভালোবাসা যেন আস্তে আস্তে গভীরথেকে গভীরতর হতে চলেছে৷ কিন্তু গভীরে যেতে যেতে যে একসময় নিজেদের দেখার আলোটাই হারিয়ে ফেলতে পারে তা কে যানে?
কিছুদিন ধরে তাদের দুজনের সামনাসামনি দেখাদেখি বন্ধ। মাঝে মাঝে মোবাইলে কথা হয়। তাও আবার বেশি না।
কিন্তু একদিন রীমার ফোন বন্ধ দেখা গেল। সেটা কোন ব্যাপার না। কিন্তু টানা দুদিন একটানা ফোন বন্ধ থাকলে সেটাও কি কোন ব্যাপার না?

দুইদিন পর রাতেরবেলা রীমার ফোন খোলা পেল সামাদ। ফোন ঢুকছে। ফোন ধরতেই রীমা বলল,

- হ্যালো!
- কেমন আছো রীমা?
রীমা ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, ভালো!
- কি হয়েছে রীমা? গলা এমন শোনা যাচ্ছে কেন তোমার?
- কি,, কিছু হয় নিতো! তা কি জন্য ফোন করেছো?
কথাটা যেন শুনতে খুব ঝাঁঝালো লাগল সামাদের। যেন মনে হচ্ছে অপরিচিত কেউ তাকে এই রাতের বেলায় ফোন করেছে।
- এরকম করে কথা বলছ কেন রীমা?
- কেমন করে কথা বলছি আমি? কেন ফোন করলে সেটা তো বললে না।
- দুইদিন ধরে কল দিচ্ছি, ফোনে পাচ্ছিনা তোমাকে। এইকদিন তোমার সাথে আমার কথা না বলে কি অবস্থা হয়েছে তা এখন তোমাকে আমার বোঝাতে হবে?
ওপাশ থেকে রীমার কোন কথা শুনতে পাওয়া গেল না।
রীমা কয়েকবার নাক টানল। তারপর বলল, আসলে ফোনটা কিছুদিন ধরে সমস্যা করছে। এমনি এমনি বন্ধ হয়ে যায়।
- নাক টেনে কথা বলছ কেন? তুমি যে মিথ্যা কথা বলছ সেটা কিন্তু আমি বুঝতে পারছি। সত্যি করে বল তোমার কি হয়েছে।
জবাব পেল না সামাদ। বরং সামাদকে অবাক করে দিয়ে ফোন কেঁটে দিল রীমা।

সামাদ যেন স্তব্দিত হয়ে গেল। যেই মেয়েটাকে একদিন ফোন না দিলে পাগল হয়ে যেত, সে আজকে তার ফোন কেঁটে দিল? কি হয়েছে রীমার? তার সমস্যাটাও তো জানা হল না। ফোনের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে রইল সামাদ। দুজনের মধ্যে মাত্র ৫০ সেকেন্ড কথাবার্তা।
একটা এসএমএস আসল সামাদের ফোনে। রীমা-ই সেটা পাঠিয়েছে। সে লিখেছে, "কালকে তুমি আমার সাথে দেখা করো প্লিজ! সকাল আটটায় আমাদের বাসার সামনে এসো! কিছু কথা আছে তোমার সাথে।"

মেসেজটা পড়েই সামাদ রীমাকে ফোন করল। মেসেজ কেন সে দিল? ফোনে সেই কথাটা বলল না কেন রীমা? অস্বাভাবিক কিছু একটা লক্ষ করেছে রীমার মধ্যে।
রীমার ফোন আবার বন্ধ। নিজের ফোনটাকে ফ্লোরে আছাড় মারতে গিয়েও তা করল না। নিজের ফোনের-ই বা কি দোষ। কিন্তু কেন ডাকল রীমা। বিশেষ কি জরুরি তার?

কি বলবে রীমা? এই কথাটা ভেবে সামাদের আর রাতের বেলা ঘুমই আসল না। দুদিন ধরে পড়াশুনা আর ঘুম কোনোটাই ভালো হচ্ছে না। সবসময় সে ভালোবাসার মানুষটাকে কাছেই পেয়েছে। কিন্তু সেটা দুরে চলে যাওয়ায় কেমন লাগে সেটা সে এখন বুঝতে পারছে। এই কদিন ধরে ভালোমতন খাওয়াদাওয়া হচ্ছে না। কোন কাজের ঠিকঠিকানা নেই।
কোনভাবে রাতটা কাঁটাল সামাদ। সকালবেলা ঘুম ভাঙল সাতটার সময়। এক ঘন্টার মধ্যেই রীমাদের বাসার কাছে উপস্থিত থাকতে হবে।

রেডি হয়ে সামাদ রীমাদের বাসার কাছে চলে আসল। তবে খুব কাছে গেল না। রীমাকে একটা ফোন দেওয়ার চেষ্টা করল সামাদ। কল ঢুকছে। রীমা ফোন ধরল। ধরেই বলল, এসেছো?
সামাদ বলল, তোমাদের বাসার পশ্চিম সাইটে দাঁড়িয়ে আছি। জলদি আসো।
- আসছি। তুমি সেখানেই দাঁড়িয়ে থাক।
সামাদ নিজেই ফোন কেঁটে দিল। এখন তো ভালোভাবেই কথা বলছে রীমা। তাহলে রাতে তার কি হয়েছিল?

একসময় রীমা আসল। কয়েকমাস আগে দুজনে নদীতে যাওয়ার পর তাদের আর কোথাও যাওয়া হয় নি। দেখাও হল অনেকদিন পর। অনেকদিন পর নিজের প্রিয় মানুষটাকে দেখে খুব ভাল লাগল তার। আজকে রীমা হালকা মেকাপ করে এসেছে। তবে আগের চেয়ে বর্তমানে রীমাকে অনেক ফর্সা দেখাচ্ছে। রীমা সামাদের কাছে আসল।
এসেই সামাদকে বলল, আজকে তোমাকে আমি একটা জায়গায় নিয়ে যাব। আমার সাথে রিকশায় চলো।
রীমা একটা রিকশা দাড় করাল আর তারপর দুজনেই রিকসায় উঠে পড়ল।

সামাদ বলল, রীমা! তোমার মধ্যে কিছু অস্বাভাবিকতা লক্ষ করছি আমি। তোমার কি হয়েছে বলবে প্লিজ!
তবে রীমা কোন কথা বলল না। সামাদ আবার বলল, আমাকে তো বলো!
- বলব। তবে এখন না।
রীমার কথায় সামাদের কেমন যানি লাগছে। যেই মেয়েটা সবসময় রিকসায় উঠলে তার গা ঘেঁষে বসেছে, হাত জাপঁটে ধরেছে। আজ সেই মেয়েটাই তার থেকে যথাসম্ভব দূরত্ব বজায় রাখছে। তবে সামাদ এখনো বুঝতে পারছে না সে কোথায় যাচ্ছে।
সামাদ বলল, এটা তো অন্তত বল যে আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি?
- সেটা গেলেই বুঝতে পারবে।

সারা রাস্তা সামাদ আর কোন কথা বলল না। রীমাও কোন কথা বলল না। দুজন চুপ করে রইল। শুধু রিকসাওয়ালাকে রীমা মাঝে মাঝে বলছে তার কোন দিকে যেতে হবে।
অনেক্ষন পর রীমা একটা যায়গায় রিকসা দাড় করাল আর সামাদকে নামতে বলল। রিকসাওয়ালাকে ভাড়া দিকে তাকে সেখান থেকে বিদায় করল। জায়গাটা অনেক নির্জন। সামনে বিশাল শান্ত একটা পুকুর। তার চারদিকে গাছ। গাছের একপাশে রাস্তা। আর সেখানেই দুজনে দাঁড়িয়ে আছে। রীমা সামাদকে বলল, আসো।
দুজনে পুকুরের একেবারে কাছে একটা গাছের নিচে দাড়াল। সামাদ বলল, এখনতো বলো! কি বলতে চাও তুমি।
রীমার চোখ দিয়ে তর তর করে পানি বের হয়ে আসল। বাপ্যারটা সামাদ কিছুই বুঝতে পারছে না। সামাদ আবার রীমাকে শান্তনা দিয়ে বলল, কোন সমস্যা থাকলে আমাকে বল আমি সমাধান করার চেষ্টা করব। তখন রীমা বলে উঠল, এটা সমাধান করার কোন কিছু না সামাদ।
সামাদ কিছুটা অবাক ও নিশ্চুপ হয়ে গেল। রীমা আবার বলল, আমাকে মাফ করে দিও সামাদ।

আমি তোমার কথাটা রাখতে পারি নি।
সামাদ বলল, এতো পেচানোর কি দরকার, সব খোলাশা করে বল।
- "আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি।"

করাৎ করে যেন একটা বাঁজ পরল সামাদের মাথায়। বুকটা ছিন্নবিচ্ছিন হয়ে গেল যেন এই মূহুর্তে।
দুজন কিছুক্ষন চুপ। মনে হচ্ছে দুটা মুর্তি পুকুর পারে গড়া হয়েছে।
কত সপ্ন দেখেছিল সে। দু'জনের বিয়ে হবে। সুখের একটা সংসার বাঁধবে। আরো কত সুখের সপ্নের জাল বুনেছিল সে। চোখের সামনে এক ফুলকি আগুনে সেই জাল যেন নিমেষেই পুড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

- আমার জন্য এতোটুকুও করতে পারলে না!
- সম্ভব না। বাবা ভালো একটা ছেলে পছন্দ করেছে আর তার সাথেই আমার বিয়ে দিবে।
- তুমি রাজি হয়ে গেলে!
- বাবার পছন্দই আমার পছন্দ। আমি ছেলেটাকে বিয়ে না করলে বাবা কষ্ট পাবে। আমি চাইনা বাবা আমার জন্য কষ্ট পাক।
আবার কিছুক্ষন চুপ করে রইল দুজনে। বলার-ই বা কি আছে আর। রীমা বলল, আমি চাইনা এখন তুমি আমাকে আর ফোন দাও। বিশেষ করে আগামী শনিবার, আমার বিয়ে।

- কেন করলে এমন। যদি বাবার পছন্দেই বিয়ে করো তাহলে আমাকে ভালোবাসতে গেলে কেন? যেদিন তোমাকে প্রোপোজ করেছিলাম সেদিন কেন ফিরিয়ে দিলে না। কেন তখন বললে না যে আমি নিজের পছন্দে কাউকে বিয়ে করতে পারব না। অন্তত কষ্টটা অনেক কম পেতাম। এতোদিন পর ঘুড়িয়ে পেচিয়ে রংবেরঙের সপ্ন দেখিয়ে এখন ছেড়ে গিয়ে কি পেলে তুমি? জবাব দাও।
রীমা বলল, আমার কি দোশ বলো! আমি কি জানতাম যে বাবা আমাকে এতোটা জোড় করে বলবে যে এই ছেলেকেই তোকে বিয়ে করতে হবে।
- তাই সেটা তুমি মেনে নিলে?
- তুমি বিষয়টা বুঝতে পারছ না। তিন বছর ধরে বিয়ে ঠেকিয়ে আসছি। এই ছেলে পছন্দ হয়নি। সেই ছেলে পছন্দ হয়নি। এভাবে আর কতদিন চলবে? আমি নিজেও হাঁপিয়ে গেছি। এভাবে আর বিয়ে ঠেকানো আমার পক্ষে সম্ভব না। তাই বাবাও ভালো দেখে একটা ছেলে দেখেছে। আমিও আর না বলিনি। তার সাথেই আমি সংসার করতে চাই।
- তাহলে আমাদের ভালোবাসার কোন মূল্য তুমি দিলে না!
- এরকম ভালোবাসার জন্য তো আর আমার জীবন থেমে থাকবে না।
- তারমানে তুমি এখন বলতে চাচ্ছো যে তোমার সাথে আমার সম্পর্কে শেষ।
- হ্যা। ব্যাস। এইটুকুই বলতে ডেকেছিলাম তোমাকে। আমি গেলাম।
রীমা পেছনের দিকে ঘুড়ে চলে যেতে আরাম্ব করল। একবার তারদিকে ফিরেও তাকাল না। সামাদ যদিও একবার বলল, একটু দাড়াও প্লিজ! কিন্তু মেয়েটা তার কথাটাকে কোন গুরুত্ব না

দিয়ে রাস্তার দিকে হন হন করে চলে গেল। সামাদ সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল।
মরে যেতে ইচ্ছে করছে তার। কি করবে এখন সে? ডুকরে কান্না আসছে সামাদের। চোখের সামনে যেন দুনিয়াটা পুরো ফাঁকা হয়ে গেল। কাছের মানুষটা যে এভাবে তাকে ছেড়ে চলে যাবে তা সে কখনো কল্পনাও করে দেখেনি। রীমা তো বলেছিল, "মরে যাব, তারপরেও তোমাকে ছেড়ে যাব না।" কথাটার তাহলে কি হল?

রীমা চলে গেল। বিশাল পুকুরপারে শুধু দাড়িয়ে আছে সামাদ। এখানে আর থেকেই বা কি হবে? কিছুক্ষন আগেও এই পরিবেশ দেখে যে মুগ্ধ হয়েছিল। এখন সেই পরিবেশটাই এখন বিষাদময় লাগছে। পৃথিবীটাকেই এখন অসহ্য লাগছে তার।
জায়গাটায় আর এক মূহুর্ত দাড়াল না সে। চলে গেল। বাসায় গিয়ে কি হবে। কিন্তু বাইরে গিয়েইবা কি হবে? তাই বাসার দিকেই চলল সামাদ।

বাসায় গিয়ে কোন কিছু করতে মন চাইল না। বিছানায় শুয়ে অঝোরে চোখের পানি ফালাতে লাগল। মন খুলে কাঁদল সামাদ। অন্তত যদি একটু শান্তি পাওয়া যায়। কিন্তু হচ্ছে না। নিজের মোবাইলটা বের করে রীমার নাম্বারে আরেকটা ফোন করল সামাদ। ফোন খোলা, তবে ব্যাস্ত। অবশেষে কি তাহলে সামাদের মোবাইল নাম্বার তার প্রেমিকার ব্লকলিষ্টে স্থান পেল?

মরে যেতে ইচ্ছে করছে সামাদের। বেঁচে থেকে আর কি বা-ই হবে। দুনিয়াতে সেই মেয়েটি ছাড়া তো আর তার আপন কেউ নেই। আর সেই যখন আজকে চলে গেল। তাহলে বেঁচে থেকেই বা লাভ কি?
বিছানা থেকে উঠে পড়ল সামাদ। টেবিলের পাশেই রাখা আছে ডায়রী। কলমদানি থেকে একটা কলম বের করে ডায়রী নিয়ে টেবিলে বসে পড়ল। নতুন একটা পাতায় সে লিখা শুরু করল,

প্রিয়, রীমা!
তুমি হয়তো বুঝবে না যে আজকে আমার কষ্টের একটা দিন। আমি তোমাকে নিয়ে কত সপ্ন দেখেছিলাম জান? সেই সপ্নের কথা ভেবেই আমি সময় কাঁটাতে পছন্দ করতাম। কিন্তু তুমি কি জান তুমি আমার সব সপ্নগুলোকে এক নিমেষেই ধুলোর সাথে মিশিয়ে দিয়েছ?
যদি জেনেই থাক তাহলে কেন করলে আমার সাথে এমন? তোমার বাবাকে কি কোনভাবেই থামানো গেল না। বিয়েটা করতেই হবে? বিয়েটা না হয় করলেই। তাই বলে আমার নাম্বার ব্লকলিস্টে? আমাকে কি তাহলে তোমার এতোটাই ঘেন্না লাগে? যদি ঘেন্নাই লাগে তাহলে ভয় পাওয়ার বাহানায় কেন আমাকে জাপঁটে ধরতে? নৌকায় বসে কেনই বা আমার বুকে হেলান দিয়ে বসতে হবে?

ধ্যাত! আসলে দোষটা আমারই। গ্রামে থাকতেই তোমাকে আমি ভালোবাসতাম। কিন্তু বলতে পারি নি। একসময় তোমরা শহরে চলে আসলে। সেদিন খুব কষ্ট পেয়েছিলাম আমি। তুমি মনে হয় জান না যে বাবাকে আমি বলেছিলাম শহরে নিয়ে যেতে। বাবা রাজি হয় নি। কয়েকদিন পর বাড়ি থেকে কিছু টাকাপয়সা নিয়ে পালিয়ে এসেছিলাম। শুধু তোমার জন্য। তোমাকে

ভালোবাসি বলেই আমি আমার বাবা মাকে গ্রামে রেখে এই শহরে পালিয়ে আসি। আজও বাবা-মার চোখে আমি অপরাধী। শুধু তোমার জন্যই এসব করেছি আমি। কিন্তু তুমি তার বিনিময়ে আমাকে কি দিলে? সেদিন আমি তোমাকে বলতে চেয়েছিলাম আমার এই শহরে কোন বন্ধুবান্ধব নেই, আত্বীয় স্বজন নেই। ভালোবাসার মানুষ নেই, সেই কথাটাও বলতে চেয়ে থেমে গিয়েছিলাম। তখন মনে হয়েছিল, তুমিতো আছ।
কিন্তু এখন বুঝতে পারলাম আমার ভালোবাসার মানুষ-ও কেউ নেই।

তোমাকে ছেড়ে আর বেঁচে থেকেই বা কি হবে। কোথায় যাব? এই শহরে কি করব আমি। গ্রামের বাড়িও আমার স্থান হবে না। তোমার মনের মধ্যে একটু জায়গা পেয়েছিলাম, কিন্তু সেখানে আমাকে থাকতে দিলে না।
তোমার সাথে হয়তো আর কোনদিন দেখা হবে না। বিয়ে করে আমাকে ভুলে যেও না। অন্তত তুমি মনে মনে আমার অস্তিত্ব রেখো। আর লিখতে ইচ্ছে করছে না। হাত বার বার কেঁপে উঠছে। তুমি ভালো থেকো!
ইতি তোমার ভালোবাসার কাঙ্গাল,
সামাদ।

লেখাটা টেবিলের পাশেই রেখে দিল। হয়তো রীমা কোনদিন এই চিঠিটা পড়ার সুযোগই পাবে না। তার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে এসে যদি অন্তত চিঠিটা হাতে পায়। সেই কারণেই চিঠিটা টেবিলের উপরেই রেখে দিল।

হাত পা প্রচন্ড রকমের কাঁপছে তার। বেঁচে থাকার ইচ্ছা শেষ। মরাই যেন এখন তার মুক্তি। কিন্তু জীবনটা দেবে কিভাবে? গলায় দড়ি দিবে?
নাহ্! ভয় লাগে। গলায় হাত দিয়ে চেঁপে ধরল সামাদ। এভাবে মরাও কঠিন। সহজ মৃত্যু চায় সে। নদীতে ঝাপ দিয়েও মরতে পারবে না সে। কারণ সে সাঁতার জানে। সাঁতার জানা লোক কখনো পানিতে আত্বহত্যা করতে পারে না। তাহলে কি করবে সামাদ?
কিছুদিন আগে দাঁড়ি কামানোর জন্য নতুন একটা ব্লেড কিনেছিল। কিন্তু কামানো হয় নি। সেই ব্লেডটা খাপ থেকে বের করে বাম হাতের কব্জির মধ্যে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে দিল একটা পোঁচ।
আরেকটা দিতে যাবে, কিন্তু নিজের রক্ত দেখেই তার মাথা ঘুড়ানো আরাম্ব করে দিল। ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হওয়া আরাম্ব করে দিল। নিমেষের মধ্যে ফ্লোর রক্তে ভিজে গেল।

একটা পোঁচ দেওয়ার পরে আর পোঁচ দেওয়ার শক্তি পেল না। হাত পা ঝিম ঝিম করা আরাম্ব করছে। তবে আসল কথা হল হাতে একটুও ব্যাথা পাচ্ছে না সে। শরীরের সব রক্ত শেষ হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। সাদা হয়ে যাচ্ছে পুরো শরির। এখন সামাদ ভাবল, সে একটু পরেই মারা যাবে।

আস্তে আস্তে মারা যাচ্ছে সামাদ। এটা কি করল সে? এই সামান্য কারণে নিজের জীবন শেষ

করে দিল? হয়তো রীমার চেয়ে ভালো মেয়ে তার জীবনে আসতে পারত। ডান হাত দিয়ে বাম হাতের কাঁটা যায়গাটা চেপে ধরল, যাতে আর রক্ত না পড়ে। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে। চোখের পাতা বন্ধ হয়ে আসছে। হাত পায়ের ঝিমঝিমানি আস্তে আস্তে বেড়েই চলছে। সামাদ বুঝতে পারল তার সময় খুব কম। রীমাকে খুব মনে পড়ছে। তার বাবা-মায়ের কথাও খুব মনে পড়ছে। চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা কারছে তার। কি করল এটা? এখন কি হবে তার?
আত্বহত্যা মহাপাপ! এভাবে মরলে তো সে সোজা জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে। অন্তত সেই কথাটা তো মাথায় আসা দরকার ছিল। তারমানে সে জাহান্নামে যাবে? মরার পরেও শান্তি পাবে না?

ইস! খুব বড় একটা ভুল করে ফেলল সামাদ। অথচ সেই কথাগুলো আগে তার মাথায়-ই আসে নি। ধপাশ করে মাটিতে পড়ে গেল সে। দাঁড়িয়ে থাকার শক্তিটাও হাঁড়িয়ে ফেলেছে সে। একসময় চোখের পাতা বন্ধ হয়ে আসল। হাজার চেষ্টা করেও আর চোখ খুলে তাকাতে পারল না। তারমানে কি তার পৃথিবী দেখা শেষ?
নিজের রক্তেই নিজের গা ভিঁজে যাচ্ছে। একসময় হাত-পাও কাজ করা বন্ধ করে দিল। নিথর হয়ে পড়ে রইল সামাদ।

এখন আর চাইলেও সে নিজেকে বাঁচাতে পারবে না। মস্তিষ্কটাই কেবল এখন চালু আছে। আগের অনেক সৃতি মাথার মধ্যে ঘুড়পাক খাচ্ছে। তার ছোটবেলার কথা মনে পড়ে গেল। খুব কষ্ট হচ্ছে সামাদের। কিন্তু শরীর এতোটাই নিথর হয়ে গেছে যে কান্নাও করতে পারছে না সে।
ছোটবেলায় বাবা তাকে অনেক আদর করত। সেই দিনগুলো কত সুন্দর ছিল! রীমার সাথেও তার অনেক সুন্দর সময় কেঁটেছে।

মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে। এমন শান্তির মৃত্যু হবে তা সে ভেবেও দেখে নি। শরীরের সব কিছু যেন আস্তে আস্তে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। মস্তিষ্কটা কেবল খোলা আছে। শুধু চিন্তা করতে পারছে এই মুহূর্তে। ফুসফুস বন্ধ হয়ে গেছে অনেক আগেই। মস্তিষ্কে অক্সিজেনের ঘাটতি পড়ছে আস্তে আস্তে। একটু পরেই যন্ত্রনা শুরু হল সামাদের। এখন সে মারা যাবে। একটা নিশ্বাস নেওয়ার জন্য তাকে এখন নিজের সাথে লড়াই করতে হচ্ছে। কাঁদতে ইচ্ছা করছে খুব। যন্ত্রণাটা কাউকে বোঝাতে পারলে ভালো লাগত। কিন্তু তা এখন সম্ভব না।

রক্তে পুরো শরীর ভিজে গেচে। হাত পা ছুড়তে পারলে মনে হয় খুব ভালো হত। নাহ্! আর সহ্য করতে পারছে না সামাদ। এক্ষনি মারা যাবে। সময় শেষ হয়ে গেল।
হঠাৎ হাত পা কাজ করতে আরাম্ব করল। হাত পা ঝাকি দিয়ে উঠল। ফুসফুসটাও সচল হয়ে গেল। বিশাল একটা দম নিল সামাদ। হৃৎপিণ্ড ধকধক করছে। এখন একটু শান্তি পেল সামাদ।

কি হচ্ছে তার সাথে আবার। আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে গেছে। তবে মনের মধ্যে এখনো ভয় কাজ করছে। চোখ মেলে তাকাল চারদিকে। ধপ করে বিছানা থেকে উঠে পড়ল সামাদ। গা পুরোটাই ঘামে ভিজে গেছে। চারদিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখল। ড্রিম লাইটের আলোয়

টিনের ঘড়ের দেয়াল ঘড়িটার দিকে সামাদ তাকিয়ে দেখল রাত তিনটা বাজে। তারমানে এতোক্ষন যাবৎ সে সপ্নে দেখল? আরাফাত, মায়া, সামাদ সাহেব, সামাদ মিয়া, রীমা, রিফাত, ইদ্রিস, মমতা, সামাদ, প্রেমিকা রীমা, এগুলো শুধুই একটা সপ্ন ছিল?
তারমানে রীমার সাথে যা ঘটেছে সব একটা সপ্ন। বাস্তবে তো সামাদ রীমা নামের কাউকে চিনেই না। কিন্তু এতো লম্বা সপ্ন? এমন সপ্ন সে তো আগে কখনো দেখে নি?

সামাদেরো কিছুদিন ধরে একটু ধকল যাচ্ছে। সামনে ওর এসএসসি পরিক্ষা। মাত্র কয়েকটা দিন বাকি। মাথার মধ্যে এমনিতেই অনেক টেনশন ঘুড়পাক খাচ্ছে। তারমধ্যে এমন ভয়ানক সপ্ন। সেখানে সে নিজেই নিজেকে হত্যা করছে।
যাক! বাঁচা গেল। তাও ভালো সেটা সপ্ন ছিল। নাহলে তাকে তো জাহান্নামে যেতে হত। সেটা ভেবেই বড় একটা নিশ্বাস ছাড়ল।

সপ্নের কথা ভেবে আর ঘুম আসল না সামাদের। ঘেমে যাওয়ার কারণে এখন অনেক শীত লাগছে তার। শুয়ে-ও থাকতে ইচ্ছে করছে না এখন। আবার একটু ঘুমাতে পারলে ভালো হত।

ঘুম আসল তবে ভোরের দিকে। কখন ঘুমিয়ে পড়েছে সে তা খেয়ালই করে নি। উঠে দেখে সকাল হয়ে গেছে। ঘড়িতে সময় ৮ টা বেজে ২৬ মিনিট। সামাদের মা ডাকতে এসেছে। হাতে চায়ের কাপ। সেটা টেবিলের উপরে রেখে দিয়ে তার মা চলে গেল।
বাবার মত সামাদেরও সকালে উঠে চা খাওয়ার অভ্যেস হয়েছে। সেই নিয়ে সামাদের মা বিরক্ত। প্রতিদিন সকালে বাপ বেটার জন্য চা করে দিতে হয়।
উঠে হাতমুখ ধোয়া তো দূরের কথা। সামাদ উঠেই একটা মোচড় দিয়ে চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে একটা চুমুক দিল। মায়ের হাতের চা, খারাপ না। যদিও চিনি একটু কম হয়েছে।
সামাদ সময়ের দিকে মনোযোগ দিল। কিছুক্ষন পরেই স্কুলে যেতে হবে। এমনিতেই আজকে অনেক দেড়িতে ঘুম ভেঙ্গেছে। রাতে অসময় ঘুম ভাঙ্গার এই একটা সমস্যা। সকাল বেলা উঠতে সমস্যা তার। আগেও এরকম অনেকবার তার হয়েছে।

চা-টা খাওয়া শেষ করে বিছানা থেকে উঠে পড়ল সামাদ। উঠেই ফ্রেশ হয়ে স্কুল ড্রেস পড়ে রওনা হল স্কুলের দিকে। স্কুল বাড়ি থেকে বেশি দূরে না। ক্লাশ আরাম্ব হওয়ার ১০ মিনিট আগেই পৌঁছে গেল। স্কুলে পরিক্ষার বিষয় সম্পর্কে পড়ানো হচ্ছে। পরিক্ষার আর মাত্র ৪ দিন বাকি আছে। এই চারদিন তো অন্তত ভালোমতন পড়াশোনা করতে হবে।
দশম শ্রেণির ব্যাচের মধ্যে সামাদ সবার প্রথমে। আর দ্বিতীয় হল জলিল। এলাকার ম্যাম্বরের ছেলে। অনেক টাকাপয়সা তাদের। লেখাপড়ায় মোটামুটি ভালোই। তবে বাবার টাকা থাকার কারনে সব দিক দিয়েই এগিয়ে।

সামাদের বন্ধু অত বেশি নেই। যাদের বন্ধু কম তাদের শত্রুও কম। কিন্তু জলিল যে সামাদের এতোটা শত্রু হবে তা সে কল্পনাও করতে পারে নি। সামাদের সাথেই যে শুধু তার শত্রুতা তা মোটেও না। ক্লাশের সকল ভালো ছাত্রদের সাথেই তার শত্রুতা। তারা যেন জলিলের দু চোখের

কাঁটা। তাছাড়া ছেলেটার মধ্যে প্রচুর অহংকার। ক্লাশের ছেলেদের সাথে বেশি কথা বলে না।

তবে এই নিয়ে সামাদ মাথা ঘামায় না। যার যার স্বভাব তার তার কাছে। নিজের ভালোভাবে পড়াশোনা করতে হবে সেটাই সে জানে। সামাদ গরিব পরিবারের ছেলে। বয়স কেবল ১৭ বছর। আয়ের একমাত্র উৎস কেবল বাবা, গ্রামের বাজারে একটা মুদির দোকান আছে তার। সেই টাকা দিয়েই সংসার চলছে তাদের। ছোট একটা ভাই আছে, নাম সাজিদ। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে কেবল। মা সংসার দেখাশোনা করে। তবে দুইভাই খুব মেধাবী ছাত্র। সংসারের অভাবের কথা তারা জানে। বাবার কাছে বেশি কিছু আবদার করতে পারে না। তবে তিনদিন ধরে সামাদের আর তার বাবার সকালবেলা চা খাবার শখ হয়েছে।
যদিও কিছুদিন আগে চা নামক শব্দটা সামাদের কাছে বিরক্ত লাগত। কিন্তু যেই মায়ের হাতে বানানো চা পেটে গেল। চা খাওয়াটা সামাদেরও নেশা হয়ে গেল। যদিও সামাদ জানে এই অভ্যেসটা সল্প দিনের জন্য।
সামাদের মা মনে করেন, চা খায় কেবল বড় লোকেরা। তাদের মত গরিব লোকেদের চা খাওয়া উচিৎ না। শুধু শুধু সামান্য লাল পানি খেয়ে টাকা খরচ করে লাভ কি?
এই কথার উত্তরে সামাদ বলে চা বড় লোকেরা খায় বলে কি আমরা ছোট লোক? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না সামাদের মা।
স্কুল ছুটি হল আড়াইটায়। সবাই ক্লাশ থেকে বের হচ্ছে। তখন একটা ছেলে সামাদের কাধে হাত দিয়ে বলল, সামাদ! তোর সাথে কথা ছিল। সামাদ পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখে আর ক্লাসমেট আবির। সামাদ বলল, কি বলবি?
আবির বলল, বাইরে এসে বলছি।

দুজনে বাইরে গিয়ে বাড়ির পথের দিকে হাঁটা আরাম্ব করল। দুজনের বাড়ির পথ প্রায় একই দিকে। আবির বলল, পরিক্ষার আর মাত্র চার দিন বাকি। কি করব কিছুই বুঝতে পারছি না। তুই কিছু হেল্প করবি?
- কি সমস্যা তোর?
- সমস্যা তো অনেক তবে বিশেষ করে রসারন আর উচ্চতর গণিত আমার অনেক সমস্যা। আমাকে এই দুটা সাবজেক্টে আমাকে সাহাজ্য করতে পারবি?
আসলে সামাদও এই দুটা বই খুব কম বোঝে। তবে যে খুব কম, তা মোটেও না। রসায়ন তার কাছে কঠিন কারন অনেক কিছু সে প্র্যাকটিক্যালি দেখতে পারে না। স্কুলে কোন ল্যাবরেটরি নেই। ধাতব সোডিয়াম, হাইড্রোক্লোরিক এসিড বা সালফিউরিক এসিড এগুলোর সে কিছুই বাস্তবে দেখে নি।
সামাদ আবিরকে শুধু বলল, সমস্যা থাকলে বাড়িতে আসিস তাহলে।
আবির অন্য রাস্তায় চলে গেল। সামাদের সাথে আর কথা হল না।

সামাদ বাড়ি ফিরে এসে গোছল করে খাওয়াদাওয়া করল। বিকালবেলা সাজিদের সাথে কিছুক্ষন বল দিয়ে খেলাদুলা করল।

সন্ধ্যা নামতেই দুই ভাই মিলে হাতমুখ ধুয়ে পড়তে বসল। সাজিদের কোন সমস্যা হলে সামাদ সেটা সমাধান করে দেয়। পড়ার ফাঁকে দুজনে মাঝে মাঝে অনেক কিছু আলাপ করে। যেমন সাজিদের সপ্ন সে বড় হয়ে একজন লেখক হতে চায়। এখন থেকেই সে গল্প লেখা শুরু করেছে। গল্পের একমাত্র পাঠক হল সামাদ। সাজিদের গল্প পড়ে সামাদ অবাক হয়ে যায়। সাজিদের লেখার হাত বড্ড ভালো। আরো একটু পরিশ্রম করলে হয়তো সাজিদ আসলেই ভালো মানের একজন লেখক হতে পারবে।
কিছুদিন আগে সাজিদ একটা গল্প লিখেছিল। গল্পের ব্যাখ্যা হল এই,
এক মা তার ছেলেকে নিয়ে থাকত শহরে। কিন্তু মা ছিল অনেক অসুস্থ। খাবে কি? তাই ছেলেটা মার জন্য অসুধ আর খাবারের জোগাড় করার জন্য রাস্তায় বের হয়। অনেক কষ্টের পর অবশেষে একটা কাজ পায় ছেলেটা। সেখানেও ছেলেটাকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু সামাদ সবচেয়ে বেশি কষ্ট পায় এটা শুনে যে ছেলেটা বাসায় মায়ের জন্য ওসুধ আর কিছু খাবার কিনে নিয়ে এসে দেখে তার মা সেখানেই মরে পড়ে আছে।

মাঝে মাঝে সাজিদও সামাদকে প্রশ্ন করে, ভাইয়া! তুমি বড় হয়ে কি হবে? যদিও সামাদের লেখাপড়া ভালো, তারপরেও সামাদ কখনো সেটা ভাবেনি। সে বড় হয়ে ডাক্তার বা শিক্ষক হবে সেরকম কিছু ভেবে দেখেনি। সাজিদের প্রশ্নের জবাবে সে বলে, ভেবে দেখিনি রে। তবে আমি বিজ্ঞানে অনেক ভালো। আমি বড় হয়ে বিজ্ঞানী হবার চেষ্টা করব।
পড়া শেষ করে প্রায় ১০ টার সময় ঘুমাতে যায় দুজনে। এই সময়টাতে ১০ টা মানেই অনেক রাত। তারমধ্যে এটা গ্রামঅঞ্চল। মানুষ অনেক আগেই ঘুমিয়ে যায়।

পরিক্ষার আর মাত্র আছে তিন দিন। আজকে স্কুলে গিয়েই সামাদ জলিলের মুখ থেকে একটা কথা শুনতে পেল। সেটা হল, এইবার পড়াশুনা কেমন হচ্ছে? দেখিস! এইবার আমার সাথে টক্কর দিয়ে পারিস কিনা।
যদিও সামাদের এই কথাটা শুনতে একটু খারাপ লাগল তবে তা নিয়ে মাথা ঘামাল না।

সামাদ মনে মনে ভাবল, ও ভালো রেজাল্ট করলে করুক। তা আমার কি? নিজের যোগ্যতায় যে রেজাল্ট করতে পারবে সেটাই তার প্রাপ্য।
জলিল মুখ ঘুড়িয়ে চলে গেল। সামাদ তার দিকে তাকিয়েও দেখল না। স্কুল আজকে অনেক আগেই ছুটি দিয়ে দিল। কালকে তাদের বিদায় অনুষ্ঠান। স্কুলের অনেক কাজ বাকি। সবার কাছ থেকে চাঁদা তোলা হয়েছে। সব ছাত্রদের মিষ্টি দেওয়া হবে। বিদায়ের ভাষন দেওয়া হবে। সবশেষে মিলাদ মাহফিল। তবে আসল কথা হল এইবার সামাদ বিদায় অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিবে। এটাই প্রথম না। এর আগেরবার পঞ্চম শ্রেণীতেও সে বিদায়ের বক্তৃতা দিয়েছিল। সামাদের বক্তৃতা শুনে কিছু স্যারদের চোখের পানি চলে এসেছিল। নিজের চোখ দিয়ে কখন পানি বেরিয়ে এসেছিল তাও সে টের পায় নি।

বাড়িতে এসে গোছল করে কিছু খেয়ে নিয়েই পড়তে বসল। যদিও লোকে বলে বিকালবেলা পড়াশোনা করা ঠিক না। তারপরেও সেই কথা বিশ্বাস করে না সামাদ। শেখার কোন সময়

নেই। বিকাল বেলা যে কোন কিছু শেখা যাবে না তা কোন বইয়ে লেখা নেই।

পরেরদিন সামাদ বিদায় অনুষ্ঠানে গেল। সেখানে গিয়ে বক্তৃতা দিল। শিক্ষক খুব খুশি হল তার বক্তৃতা শুনে। ক্লাশের সবাই খুশি হল, তবে একজন বাদে। সে হল জলিল। হিংসায় যেন জ্বলতে লাগল সে। সবার মুখে সামাদের সুনাম সহ্য করতে পারল না জলিল।
মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হল। বিদায়ী ছাত্রদের জন্য দোয়া করা হল। দোয়া শেষে সবার হাতে হাতে মিষ্টি দেওয়া হল। সামাদ সাজিদকেও সাথে নিয়ে গিয়েছিল। সামাদ আরো কিছুক্ষন বন্ধুদের সাথে থাকতে চাইলেও সাজিদের জন্য আর হয়ে উঠল না। চলে আসতে হল বাড়িতে।
কালকের পরেরদিন পরিক্ষা। প্রথম দিন বাংলা ১ম পত্র পরিক্ষা। তার পরেরদিন বাংলা ২য় পত্র। আজকে দুটো বিষয়ই ভালোমতন সারাদিন রিভিশন দিবে।
সাজিদ সামাদের কাছে এসে বলল, ভাইয়া তোমার দেওয়া ভাষনটা আজকে খুব ভালো লেগেছে। আচ্ছা ভাইয়া, তুমি কি আর কোনদিন স্কুলে যাবে না?
- যাব। অন্য কোন বড় স্কুলে।
- কোথায়?
- ভালো কোন স্কুলে।
- আচ্ছা! তোমার পরিক্ষা শেষ কবে?
- আরো একুশ দিন পরে। আমি তোর সাথে এখন বেশি খেলতে পারছিনা, সেই কারনেই তুই প্রশ্নটা করলি তাই না?
- পরিক্ষা শেষ হলে আবার আমরা একসাথে অনেক খেলব।
- হুম। তখন তো আমার আর পড়া থাকবে না। আর তাহলে তুইও কিছুদিন ভালোমতন পড় তাই পরে একটু কম পড়লেও চলবে।
- তুমি ঠিক বলেছো ভাইয়া।
- তাহলে এখন যা। আমাকে পড়তে দে।
সাজিদ চলে গেল।

সামাদের প্রস্তুতি খুব ভালো হচ্ছে। বইয়ের সব কিছুই অনেক আগেই পড়া হয়েছে। এখন রিভিশন দিতে কোন সমস্যাই হচ্ছে না। বিকালের দিকে সামাদ একটু তার বন্ধুর বাড়ি গেল। সামাদের একটা ভালো বন্ধু আছে, নাম হাসান। সামাদের মতোই ভালো ছাত্র। তবে খেলাধুলার প্রতি অনেক ঝোক।
হাসানদের বাড়িতে গিয়ে সামাদ পড়ালেখার খবর জানতে চাইল। হাসানের একদিকে সুবিধা হয়েছে আর তা হল, তার সামনে পেছনে দুজন ভালো ছাত্রর সিট পড়েছে। একটু হলেও তাদের কাছ থেকে হাসান সাহায্য পেতে পারবে। কিন্তু সামাদ তা পারবে না। কারন, তার সামনে কে আছে তা সে নিজেও যানে না। আর পেছনে আছে জলিল। জলিলের চেহারা দেখলেই সামাদের কেমন যেন লাগে।

আজকের দিনটা ভালোমতনই কাটল। পরিক্ষা আরো সামনের দিকে এগিয়ে আসছে। আর মাত্র এক দিন আছে পরিক্ষার। সামাদ আজকে দিনের বেশিরভাগ সময়ই পড়াশোনাতেই কাঁটাবে।

ঠিক তাই করল। মাঝের কিছু সময় বাদ দিয়ে সেদিন আর ঘড় থেকে বের হল না। রাতেই পরিক্ষার দরকারি কাগজপত্র ফাইলের মধ্যে গুছিয়ে রাখল। আজকে সামাদ দ্রুতই ঘুমিয়ে পড়বে। পরিক্ষার জন্য পড়ালেখা যেমন প্রয়োজন, ঘুমও ঠিক তেমনি প্রয়োজন। ভালো ছাত্র হতে হলে অবশ্যই নিয়মিত ঘুমাতে হবে।
একটু বাংলা বইটা পড়েই সামাদ সেদিনকার মত ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে উঠেই আজকে ফজরের নামাজ পড়ল সামাদ। তারপর আবার একটু রিভিশন দিতে বসল বইটা। সকাল ১০টায় পরিক্ষা। আজকে নয়টার একটু আগেই বের হবে। আটটা বাজলে সামাদ খেয়েদেয়ে পরিক্ষার জন্য রেডি হতে লাগল। ফাইলপত্র, কলম, স্কেল সবগুলোই গুছিয়ে রাখল। পরিক্ষা দেওয়ার আগদিয়ে বাবা-মা সবার কাছথেকে দোয়া চেয়ে নিল। ছোট ভাই সাজিদের কাছ থেকেও দোয়া নিতে ভুলল না।

একসময় সামাদ রওনা হল। সামাদের বাবা বলল ভালোভাবে পরিক্ষা দিস বাবা। মনোযোগ দিয়ে পরিক্ষা দিবি। কোন সমস্যা হলে স্যারকে জানাবি। মনে রাখিস এবার কিন্তু তোকে ভালো রেজাল্ট করতেই হবে।

সামাদ বের হয়। বাবা-মা একটু সময়ের জন্য সামাদকে এগিয়ে দিল। রাস্তায় গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছে সামাদ। সে জানে আজকে গাড়ি পেতে একটু ঝামেলা হবে। সেজন্য আগেভাগেই বের হয়েছে। তবে যতটা দেড়ি হওয়ার কথা ভেবেছিল ততটাও দেড়ি হল না। দশ মিনিটের মধ্যেই একটা সিএনজি পাওয়া গেল। উঠে পড়ল সেটার মধ্যেই।
পরিক্ষার হলে যেতে চল্লিশ মিনিটের মত সময় লাগল। পরিক্ষার আরো আধা ঘণ্টার মতো সময় বাকি আছে। সবাই নিজেদের সিট খুজে নিতে ব্যাস্ত। সামাদ-ও তার সিট খুজতে আরাম্ব করল।
অবশেষে পেয়েও গেল তার সিট। তার সামনে মোটমতন একটা ছেলে বসেছে। গায়ের রঙ ফর্সা। দাঁতগুলো ছোট ছোট। চুলগুলো একটু সাইজে বড়। তবে দেখে মনে হচ্ছে ছাত্র মোটামুটি ভালোই। শরিরের গঠন দেখে তো আর ব্রেনের তুলনা করা যাবে না।

জলিল এখনো এসে পৌছায় নি। ৯ টা ৪০ বাজে। একটু পরেই স্যারেরা আসলেন অনেকগুলো খাতা নিয়ে। দপ্তরিরা খাতা দেওয়া আরাম্ব করে দিয়েছেন। ২০ মিনিটের মধ্যে রোল নাম্বার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার সব লিখে ফেলতে হবে। ৯ টা ৫০ এ জলিল আসল। একটা স্যার জলিলকে বলল, প্রথম দিনই এতো দেরিতে আসলে কেন? জলিল কোন উত্তর দিল না। নিজের ব্রেঞ্চে বসে খাতা পেয়েই লিখা আরাম্ব করল।

১০ টা বাজার সাথে সাথেই সবাইকে প্রশ্নপত্র দেওয় হল। সবাই লেখা শুরু করল। বিসমিল্লাহ বলে সামাদ-ও লেখা আরাম্ব করল। সমাদের কাছে প্রশ্ন খুব সহজই হয়েছে। ভালোভাবে লেখতে পারলে পরিক্ষা ভালোই হবে আজকে। লেখতে লেখতে সময় এক ঘন্টা পার হয়ে গেল। সামাদের সামনের ছেলেটাও ভালোই লেখছে। দেখে তো ভালো ছাত্রই বলে মনে হচ্ছে।

এক ঘন্টার মধ্যে সামাদ অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ফেলেছে। জলিলের দিকে একটু তাকিয়ে দেখল, বেচারা একটু একটু লেখছে আর কলম কামড়াচ্ছে। সামাদ ভাবছে এইভাবে পরিক্ষা দিয়েও জলিল ভালো রেজাল্ট করে কিভাবে? জলিলের কথা ভাবা বন্ধ করে নিজের লেখার দিকে মনোযোগ দিল এইবার।
কিন্তু কিছুক্ষন পরেই কালো শুকনামতন একটা স্যার জলিলের হাতে চুপি চুপি কয়টা কাগজ ধরিয়ে দিয়ে সাথে সাথেই সেখান থেকে বিদায় হয়ে গেল। বিষয়টা আর কেউ দেখেছে বলে মনে হল না। স্যারটা যাওয়ার কিছুক্ষন পরেই সামাদ জলিলের দিকে একটু মাথাটা ঘুড়িয়ে দেখল, জলিল সেই কাগজটা দেখে সমানে লিখেই যাচ্ছে। কাগজের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেককিছু লিখা। বিশেষ করে সৃজনশীল প্রশ্নের ক আর খ নাম্বার।

সামাদ লিখছিল আর মাঝে জলিলের দিকে তাকিয়েছিল। জলিল লিখছে তো লিখছেই। যে স্যার কাগজটা দিয়েছে সে মাঝে মাঝে নজর রাখছে। কাগজটা একটু আড়ালেই রেখেছে। যাতে কোন স্যারদের নজরে না পড়ে। মাঝে মাঝে জলিল সামাদের দিকে কেমনভাবে যেন তাকাচ্ছে। সামাদ বুঝতে পারছে জলিল তাকে হিংসা করছে।
কিছুক্ষন পর পরিক্ষার হল পরিদর্শন করার জন্য অফিসার আসল। কিন্তু পুরো ব্যাপারটা ছিল পুরোটাই গোপন। কোন স্যারেরাই জানত না যে অফিসার পরিক্ষার হলে আসবে। হটাৎ করে চলে আসায় পুরো রুমের টিচাররা একেবারে থতমত খেয়ে গেল। বিশেষ করে যেই স্যারটা জলিলকে নকল দিয়েছিল, সেই স্যারটা। তবে জলিল সব স্যারদের এভাবে অপ্রস্তুত হতে দেখে নিজেই সামলে নিল। নকলটা ভাঁজ করে কোথায় যেন রেখে দিল, আর স্বাভাবিকভাবেই লিখার ভান করল। সামাদ মনে মনে একটু খুশিই হল।

সব স্যাররা এখন একটু নিশ্চিন্ত হয়েছিল। অন্তত তাদের হলে কোন প্রকার নকল চলছে না। অফিসার একটু খুশিই হলেন বরং। অফিসার বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ পরিক্ষার হলে কোন কাগজ টাগজ নিয়ে এসে থাকলে এখনি আমার কাছে জমা দাও। আমরা যদি কোন কাগজ তোমাদের সামনে পাই। তাহলে কিন্তু পরিক্ষা বাতিল করে দেব। সামাদ লিখছে। যে ছাত্ররা এতোক্ষন যাবৎ দেখাদেখি করে লিখছিল, এখন তারা বসে বসে কলম কামড়াচ্ছে।

সামাদ লিখছে। এমন সময় অফিসার কাকে যেন বললেন, এই ছেলে দাঁড়াও। কাকে কথাটা বলল তা বুঝতে পারল না সামাদ। কিন্তু অফিসার আবার বললেন, তোমাকে বলছি, দাঁড়াও। সামাদ শব্দের উৎসের দিকে তাকিয়ে চমকে গেল। কারন সামাদ দেখল, অফিসার তার দিকেই তাকিয়ে কথাটা বলছে। এখনো যেন সামাদ কথাটা বুঝতে পারে নি। অফিসার তাকে ধমক দিয়ে বলল, দাড়াও!
সামাদ দাঁড়াল। এখনো কিছুই বুঝতে পারছে না সে। অফিসার বলল, বলেছি না! যদি কারো কাছে কাগজ থাকে তবে আমার কাছে জমা দিতে।

সামাদ এখনো তার কথা বুঝতে পারে নি। অফিসার আবার বলল, তোমার ব্রেঞ্চের নিচে

কিসের কাগজ ওটা? সামাদ একটু খোজাখুজি করেই একটা দুমড়ানো মোচড়ানো কাগজ পেল।
অফিসার বলল, আমাকে দেখাও কাগজটা।
সেটা কিসের কাগজ সামাদ এখনো তা বুঝতে পারে নি। তবে তিনি যেহেতু আদেশ করেছেন তাই কাগজটা তুলতেই হল। অফিসার লোকটা বলল, কাগজের ভাঁজ খোল।
সামাদ আশেপাশে তাকিয়ে দেখল সবাই তার দিকে এই মূহুর্তে তাকিয়ে আছে। সামাদ কাগজটার ভাজ খুলতে লাগল। কাগজের ভাঁজ খুলে সামাদ অবাক হয়ে দেখল সেটা জলিলের সেই কাগজটা। যেটার মধ্যে প্রশ্নের অনেকগুলা উত্তর আছে।

অফিসার সামাদের হাত থেকে কাগজটা খপ করে নিয়ে গেল। অফিসার পড়ে বুঝতে পারল সেটার মধ্যে বাংলা পরিক্ষার অনেকগুলো উত্তর আছে।

অফিসার অগ্নিশর্মা হয়ে সামাদের দিকে তাকাল। সামাদকে ধমকের স্বরে বলল, তোর সাহস তো কম না! তুই পরিক্ষার হলে এভাবে কাগজে উত্তর লিখে এনেছিস? যদিও সামাদ বলল, স্যার এটা আমি লিখে আনি নি। তবে লোকটা সামাদের কথা শোনার চেষ্টাও করল না। সামাদের গালের মধ্যে ঠাস করে লোকটা একটা চড় বসিয়ে দিয়ে ব্রেঞ্চের উপর থেকে খাতাটা টান দিয়ে হাতে তুলে নিয়ে বলল, তোর পরিক্ষা দিতে হবে না। বাড়ি চলে যা।
সামাদের প্রচন্ড রকমের রাগ হতে লাগল আর মনও খারাপ হতে লাগল। পেছনে জলিল মাথা নিচু করে লেখার ভান করছে। সামাদ অফিসার লোকটাকে বলল, স্যার এই কাগজটা আমি ফালাইনি।
- চুপ। তোদের জন্যই দেশের শিক্ষার অবস্থা খারাপ। এক্ষনি হল থেকে বের হয়ে যা। তোর খাতা বাতিল।
- আপনি কেন বিশ্বাস করতে পারছেন না। আমি এই কাগজ কেন আনতে যাব?
- কাগজ কি তাহলে তোর ব্রেঞ্চের নিচে হেঁটে হেঁটে এসেছে?
- আমি জানি না কাগজটা এখানে কিভাবে আসল। তবে আমার পিছনের এই ছেলেটা কাগজটা আমার ব্রেঞ্চের নিচে দিয়ে দিয়েছে।
জলিল তখন শান্তভাবে অফিসারের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি কিসের জন্য এই কাগজ আনতে যাব? এই ছেলেটা কিছু বললেই কি সেটা সত্য হয়ে যাবে?
সামাদ জলিলকে বলল, "মিথ্যে বলছিস কেন? কাগজটা দিয়ে তো তুই-ই লেখছিলি।" যেই স্যার জলিলকে কাগজটা দিয়েছে তাকে হাত দিয়ে ইশারা করে সামাদ বলল, ওই স্যার এই ছেলেকে কাগজটা দিয়েছে।

এই কথা বলার পর সেই স্যারটি সামাদের দিকে তেড়ে এসে হুংকার দিয়ে বলল, তোর সাহস তো কম না দেখছি। নিজে নকল এনে ধরা পরে এখন আবার আমার ঘাড়ে দোশ চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে।
এই ছেলে! স্যার তোকে বের হয়ে যেতে বলেছে না? তোর পরিক্ষা বাতিল। এই দারোয়ান! ছেলেটাকে বের করে দাও তো।

সামাদ এখনো অফিসারকে বোঝানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু অফিসার তার কথা কোনভাবেই শুনল না। কালোমতন একটা দারোয়ান, হাতে বিশাল একটা লাঠি। সে সামাদের দিকে এগিয়ে এসে বলল, বের হ। সামাদ একসময় বের হতে না চাইলেও দারোয়ান লোকটা সিট থেকে টেনে সামাদকে বের করে ফেলল। পিঠের মধ্যে ধাক্কিয়ে ধাক্কিয়ে দরজার কাছে নিয়ে গিয়ে বলল, এখান থেকে সোজা বাসায় চলে যাবি।

দু চোখ দিয়ে ঝরঝরিয়ে পানি পড়তে আরাম্ব হল। শেষ চেষ্টাও করে দেখল সামাদ। কিন্তু কোনভাবেই কোন স্যার রাজি হল না। দয়া করেও না। কি করবে এখন সামাদ? এখনো সেখানেই ঠায় দাঁড়িয়ে আছে সে। ভেতরে অফিসার বলছে, আর কারো কাছে যদি এরকম কোন ধরনের কাগজ পাওয়া যায়। তাহলে ওই ছেলের মত অবস্থা করবো তোমাদের।

একসময় সামাদ বাইরে চলে আসল। খাতায় রিজেক্ট স্বাক্ষর হয়ে গেছে। আর কিছু করার নেই। এভাবে একটা ছেলের দুইটা বছরের পরিশ্রম নষ্ট করে দেওয়া হল। একটু দয়াও তাদের হল না। এখানে থেকে বরং আর কি হবে।
বাড়িতে গিয়েই হাওমাও করে কান্না আরাম্ব করে দিল সামাদ। তার মা কি হয়েছে শুনে সামাদ তার মাকে সব কথা খুলে বলল। তার মা শান্তনা দিতে দিতে তার ছেলের কান্না দেখে নিজেই একসময় কেঁদে দিলেন। কি হবে এখন? খাতা বাতিল হলে তো পরিক্ষায় পাস আসবে না।

সামাদের মা শুধু বলেছে, চিন্তা করিস না। আল্লাহ্ যা করেন তা ভালোর জন্যই করে। তবে সামাদ ভাবে এর মধ্যে ভালোর কি আছে?
সামাদের বাবা ফিরে এসে সামাদকে শান্তনা দিল। সামাদের কান্না কোনভাবেই থামছে না। তার বাবা তাকে বুঝাল, তুই তো আর খারাপ ছাত্র না। একবার ব্যার্থ হয়েছিস তাই কি হয়েছে। সামনের বার আবার চেষ্টা করবি। যারা ভালো তারা সহজেই ভেঙে পড়ে না। সুতরাং তোর-ও ধৈর্য ধারণ করতে হবে।
যদিও সামাদের বাবার কথায় তার একটু হলেও মন নরম হয়েছে। তবে পুরোপুরি নরম হল না। যেখানে সবাই ভালোমতন পরিক্ষা দিয়ে উপরের শ্রেণিতে উঠে গেল সেইখানে সামাদ পরিক্ষা না দিতে পারায় এক বছর পিছিয়ে গেল।

জলিলের প্রতি তার রাগ হচ্ছে অনেক। ওর জন্যই আজকে সামাদের এই অবস্থা। সামদকে ঠকিয়ে ও কি অনেক ভালো রেজাল্ট করতে পারবে? এভাবে কাউকে ঠকিয়ে কি পেল ও? এর প্রতিশোধ সে নেবেই নেবে। ছেলেটার একটা বৎসর কেউ এভাবে নষ্ট করে দিল। আর সে চুপ করে বসে থাকবে তা হবে না।

বেলা একটার সময় পরিক্ষা শেষ হয়েছে। সবাই মনে হয় এতোক্ষনে বাড়িতে চলে এসেছে। বিশেষ করে জলিল-ও। আজকেই ওর বাবার কাছে বিঁচার নিয়ে যাবে সামাদ। সে এলাকার মেম্বর। কিছু একটা তো করবেই।
সেদিন বিকালবেলায়-ই সামাদ গেল জলিলের বাবার কাছে। সে কেবল বাড়ি থেকে বের হচ্ছে।

কোথাও যাবে হয়তো। তখনি সামাদের সাথে তার দেখা।

জলিলের বাবা তাকে দেখেই বলল, তোমার নাম সামাদ না? তা কিসের জন্য এসেছো?
- আপনার ছেলে কিন্তু দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। সে কথা কি খেয়াল রাখেন?
- জলিলের কথা বলছ? কেন! কি করেছে ও?
- আজকে ওর কারনে আমার পরিক্ষা বাতিল হয়ে গিয়েছে।
- কিভাবে?
- আপনার ছেলে পরিক্ষায় নকল করে। লেখা শেষ করে আমার ব্রেঞ্চের নিচে কাগজ রেখে দেয়। অফিসার এসে তো আমাকে দোষারোপ করা আরাম্ব করে। তিনি আমার খাতা বাতিল করে দেয়।
- সেটা তো সেই অফিসারের দোষ। তা আমার ছেলের দোষটা কোথায়?
- আপনি কি এখনো কিছুই বুঝতে পারেন নি। আপনার ছেলে যদি আমার পায়ের কাছে কাগজটা না ফালাত তাহলে তো আমার খাতা বাতিল হত না।

জলিলের বাবা কিছুক্ষন চুপ করে থেকে ঠান্ডা স্বরে বলল, শোনো বাবা! আমার ছেলে কেমন তা আমি ভালোভাবেই জানি। অফিসার তোমার খাতা বাতিল করে দিয়েছে আর তুমি কিনা আমার ছেলের বিপক্ষে বিচার নিয়ে এসেছ। আমার ছেলে হচ্ছে হাজারে একটা। ও এমন করতেই পারে না। আর পরিক্ষায় কি শুধু আমার ছেলেই নকল করে। আর কেউ করে না?
সামাদ যেন জলিলের বাবার কথা শুনে কিছুক্ষন হা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এলাকার মেম্বার বলে নিজের ছেলের বিচার করল না।

সামাদ একসময় বলেই ফেলল, আপনার ছেলের বিচার করলেন না তো। তাহলে আমিই যাচ্ছি। আপনি আমাকে চেনেন না। যদি আপনি আপনার ছেলেকে শাসন না করেন তাহলে আপনার যত কুকীর্তি আছে সব এলাকার মধ্যে ছড়িয়ে দিব।

সামাদ চলে গেল। বিকাল হয়ে আসছে। আসার সময় সামাদ দেখল জলিল কয়েকজন বন্ধুদের সাথে রাস্তার পাশে বসে আড্ডা দিচ্ছে। জলিল দূর থেকে সামাদকে দেখে ডাক দিল। প্রথমে সামাদ ভাবল সে যাবে না। কিন্তু পরক্ষনেই মত পালটে ফেলল। জলিলের দিকে হাঁটা ধরল।
সামাদ কাছে আসতেই জলিল বলল, আহারে! পরিক্ষাটা দিতে পারলি না। জলিলের বন্ধুগুলাও একটু হাসার ভংগি করল।
সামাদ তখন বলল, আমার সাথে এইরকম খারাপ কাজ করে তুই মোটেও ভালো করিস কি। জলিল একসময় বসা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সামাদের আরো কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, কি করবি তুই, পরের পরিক্ষার সময়ও আমি এই একই কাজ করব। দেখি তুই কি করতে পারিস। সামাদ ভাবল এভাবে চুপ থেকে কিছুই হবে না। আজকে যদি কিছু না করে তাহলে পরের পরিক্ষায়ও তাকে এভাবে ফাঁসাবে জলিল।
- ভালোয় ভালোয় বলে দিচ্ছি আমার রাস্তা থেকে সরে যা।
- আমি কি করব না করব সেটা তোকে বলতে হবে?

সামাদের রাগ চরম মাত্রায় পৌছে গেল। রাগের মাথায় সামাদ জলিলের আরো কাছে গিয়ে কলারটা টেনে ধরে বলল, মেম্বারের ছেলে বলে কি সবজায়গায় মাতাব্বরি করবি? অন্তত আমার সামনে না। বুঝেছিস! জলিল কিছু সময়ের জন্য যেন ভয় পেয়ে গিয়েছিল। শেষমেশ জলিল সামাদের হাতটা ছাড়ানোর চেষ্টা করেও ব্যার্থ হল। বিনিময়ে জলিল সামাদের কাছ থেকে একটা ঘুষি উপহার পেল। সোজা নাক বরাবর। জলিল কিছু সময়ের জন্য যেন হা হয়ে গেল। কি করবে তা ভেবে পাচ্ছে না। গালের একপাশে চার আংগুলের চারটা রক্তাভ দাগ দেখা গেল। জলিলের বন্ধুরাও ভয় পেয়েছে মনে হয়। সামাদ আর এক মূহুর্তও সেখানে দাড়াল না। চলে আসল সেখান থেকে।

ইস! শুয়রের বাচ্চার সাহস তো কম না। আমার ছেলের গায়ে থাপ্পর মেরেছে। ইস! গালটা কেমন লাল হয়ে আছে। তুই চিন্তা করিস না। ওই সালাকে আমি দেখে নেব। আমার ছেলের গায়ে হাত? তা তুই কিছু বললি না কেন ওকে?
- আমি তো শুধু তোমার কথা ভেবে ওকে কিছু বলি নি। আমি যদি তখন ওকে কিছু বলতাম তাহলে এটা গ্রামের মধ্যে ছড়াছড়ি হয়ে যাবে যে মেম্বরের ছেলে এলাকায় ঝগড়া করে।
- এমনটা তো ভেবে দেখিনি। তুই খুব ভালো কাজ করেছিস। তবে চিন্তা করিস না। আমি কালকের মধ্যেই লোক ভাড়া করে ওর একটা ব্যাবস্থা করছি।

সামাদ বাড়িতে গিয়ে মন খারাপ করে বসে রইল। কালকে বাংলা দ্বিতীয় পত্র পরিক্ষা। কিন্তু কোনভাবেই পড়ার দিকে মনোযোগ দিতে পারছে না। মাথার মধ্যে শুধু চিন্তা ঘুড়পাক খাচ্ছে। কালকেও কি জলিল একই কাজ করবে? একটা কিছু করতেই হবে কালকের মধ্যে।

কালকে সামাদ আবার পরিক্ষা দেওয়ার জন্য বের হল। কালকের মতই আজকেও জলিল দেড়িতে আসল। তবে সামাদ চিন্তা করছে মাঝে মাঝে ব্রেঞ্চের নিচে তাকিয়ে দেখবে। জলিল কেমন যেন আজকে ফুলে ফেঁপে আছে। কালকের থাপ্পরের দাগটা মিলিয়ে গেছে। সামাদ-ও জলিলের দিকে আর তাকালো না।
সামাদ যা ভেবেছিল তা হয়নি। আজকে জলিল তেমন কিছু করে নি। সামাদের পরিক্ষা খুব ভালো হয়েছে। জলিলের কি অবস্থা হয়েছে তা সামাদ জানে না।

বাড়িতে এসে পরিক্ষা ভালো হওয়ার কারণে সামাদের চিন্তা একটু কমেছে। মেজাজ আজকে একটু ভালো লাগছে। কালকে পরিক্ষা নেই। তার পরের দিন ইংরেজি পরিক্ষা। ইংরেজিতেও সে অনেক ভালো।
বিকালের দিকে সামাদ একটু বাইরে ঘুড়তে গেল। গন্তব্য তার বন্ধু হাসানদের বাড়ির দিকে। হাসানের পরিক্ষাও মোটামুটি ভালোই হচ্ছে।
হাসানদের যাওয়ার রাস্তার পাশে একটা দেয়ালে ঘেরা গোরস্থান চোখে পড়ে। মানুষজন সেখানে নেই বললেই চলে। মাঝে মাঝে কয়েকটা ভ্যান রিক্সা যায়। তারমধ্যে এখন বিকাল হয়ে গেছে। আশেপাশ এক্কেবারে নিরব।

সামাদ স্বাভাবিক ভাবেই হেঁটে যাচ্ছে। কিন্তু ঠিক গোরস্থানের ওপাশ থেকে কেউ একজন প্রচন্ড বেগে ঢিল ছুড়ল সামাদের দিকে। লক্ষ বিভ্রান্ত হল না। গিয়ে লাগল ঠিক সামাদের মাথায়। কে এই কাজটা করল তা বুঝে উঠার আগেই মাথাটা এক চক্কর দিয়ে ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেল সে। বড় একটা ইটের দলা। মাথার একটা জায়গায় লেগে কেঁটে গেছে। ঝড়ঝড়িয়ে রক্ত বের হতে লাগল এক সময়।

সামাদ শুধু দেখতে পেল কয়েকটা বড় বড় ছেলে তার চোখের সামনে আসল। তাদের সবার হাতে মোটা মোটা লাঠি। ভালোভাবে তাকাতেও পারছে না সামাদ। তবে ছেলেগুলোর কথাগুলো ভালোভাবেই শুনতে পারল। ছেলেগুলো বলছে, সালা! তোর তো দেখি অনেক সাহস বেড়ে গেছিল। ছোটলোকের ছেলে হয়ে মেম্বরের ছেলের গায়ে হাত তুলেছিস।

সেই ছেলেগুলোর মধ্যে জলিলও ছিল। জলিল বলল, এই একটা মারে কাজ হবে না। আরো কয়েকটা দিয়ে বুঝাতে হবে কত ধানে কত চাল।

কথাটা বলেই জলিল সেই ছেলেগুলোকে বলল, তোরা শুরু কর।
সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেগুলো সামাদকে সেই লাঠিগুলো দিয়ে শরিরে মারতে আরাম্ব করে দিল। লাঠির প্রত্যেকটা আঘাতে যেন হাড়গুঁড় গুড়ো হয়ে যাচ্ছে। দেহের সব শক্তি যেন হাড়িয়ে যাচ্ছে। কোনমতেই ছেলেগুলো মারা থামাল না। সামাদ কিছুই ভালোমতন দেখতে পারছে না। সবকিছু ঘোলা দেখা যাচ্ছে। জলিল একসময় একজনের কাছ থেকে একটা লাঠি নিয়ে সামাদের মাথায় জোড়ে একটা বারি দিল। কিন্তু বারিটা জোরেই হয়ে গেল। রাগের মাথায় একটু জোরেই হয়ে গেছে।
সামাদের মাথার মধ্যে ঝিনঝিনিয়ে উঠল। আর কিছু মনে করতে পারছে না সে। শুধু একটা জিনিসই বুঝতে পারছে যে সে মারা যাবে। এই মূহুর্তে যদি তাকে কেউ বাঁচাতে না আসে তাহলে সামাদ কোনভাবেই বাঁচতে পারবে না।

কিন্তু এইসময় এখানে অন্য কেউ আসা একটা অলৌকিক ব্যাপার। সামাদ নিথর হয়ে পড়ে আছে। ছেলেগুলো জলিলকে বলল, এটা কি করলি! মাথাটা এক্কেবারে ফাঁটিয়ে ফেললি? মারা যায় যদি!
এই কথাগুলোর একটা কথাও তখন সামাদের কানে পৈচ্ছাচ্ছে না। একটা ছেলে তখন বলল, কেউ আসার আগেই আমাদের এখান থেকে সরে পড়তে হবে। একজনও দেখে ফেললে সর্বনাশ হয়ে যাবে।
ছেলেগুলো আর এক মূহুর্তও দেরি করল না। লাঠিসোঁটা নিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল।
সামাদ একাই পড়ে আছে। মাথা ফেঁটে রাস্তার পিচ রক্তে লাল হয়ে যাচ্ছে। সামাদ বুঝতে পারছে তার বাঁচার আশা প্রায় শেষ। এই সময় কেউ তাকে বাঁচাতে আসবে না।
কি হবে এখন সামাদের? সে তো অনেক লেখাপড়া করতে চেয়েছিল। বিজ্ঞানী হয়ে চেয়েছিল। বাবা-মায়ের মুখ উজ্জ্বল করতে চেয়েছিল। সব সপ্ন কি তাহলে এক নিমেষেই ধুলিস্বাত হয়ে

যাবে? সব সপ্ন পূরণ করার আগেই কি সে পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে?
মাথার ঝিমঝিমানি আরো বেড়েই চলেছে। আর কিছু কল্পনা করতে পারছে না সামাদ। সবকিছু সপ্নের মত মনে হচ্ছে। সামাদ সপ্নে দেখছে, সাজিদ অনেক বড় একজন লেখক হয়েছে। ওদের বাবা-মায়ের অভাব দূর হয়েছে। সবই আছে ওদের। শুধু একটা জিনিস নেই। সেটা হল "সামাদ"।

সামাদ আশেপাশে চোখ মেলে তাকাল। এখন রাত কয়টা বাজে তা সে বলতে পারবে না। চারপাশে অন্ধকার। আশেপাশে আলো জ্বালানোর মত কিছু নেই। বিছানা থেকে উঠার চেষ্টা করল। কিন্তু উঠার শক্তিটাও নেই। টানা বারো দিন ধরে অনেক জ্বর। প্রথম কয়েকদিন জ্বর কম থাকলেও সময় যত বাড়ছে জ্বর যেন ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

রাতে শোয়ার সময় সামাদের বাবা কপালে জলপট্টি দিয়ে দিয়েছিল। সেটা এখন নেই। অনেক্ষন যাবৎ সপ্নে দেখছে সে। বুকের ভিতরটা এখনো ধক ধক করছে। সপ্নের রেশ এখনো মাথা থেকে যায় নি। সবকিছু সপ্ন ছিল। আরাফাত, মায়া, সামাদ সাহেব, সামাদ মিয়া, রীমা, রিফাত, ইদ্রিস, মমতা, সামাদ, তার প্রেমিকা রীমা, জলিল, সাজিদ, সবই সপ্ন ছিল? এতো লম্বা সপ্ন?
সামাদ বিছানা থেকে উঠতে পারে না। শক্তি যেন ফুরিয়ে গেছে। রাতে আর ঘুম আসবে না। প্রতি রাতেই এমন হয় তার সাথে। সারাদিন শুয়ে থাকার ফলে ঘুমানোর কোন শিডিউল নেই। যেদিন সকালে অনেক ঘুম হয়, সেদিন রাতে আর ঘুম হবে না।

সকালের দিকে সামাদের ঘুম ভাঙ্গল। অনেক দিন ধরে সুর্যের সাথে দেখা নেই সামাদের। ছয় দিন আগে সামাদের বাবা সামাদকে গোছল করে দিয়েছিল। তারপরে আর গোছল করে নি। ছয় দিন গোছল না করলে কি অবস্থা হতে পারে তা সবাই জানে। সামাদের বাবা বলেছে আজকে বাইরে নিয়ে গিয়ে গোছল করিয়ে দিবে।
সামাদের যখন তিন বছর তখন ওর মা মারা যায়। আপন বলতে শুধু বাবা-ই।

সকালে সামাদের বাবা সামাদকে কোলে করে নিয়ে গোছল করানোর জন্য বাইরে গেল। সামাদ ছয় দিন পরে বাইরের পৃথিবী দেখার সৌভাগ্য পেল। সামাদের বাবা সুন্দর করে গরম পানি দিয়ে তাকে গোছল করিয়ে দিল। গোছল করার পরে কিছুক্ষন এখানেই বসে থাকবে সে। রোদের অভাবে গায়ের চামড়া সাদা হয়ে যাচ্ছে। ইদানিং সামাদ খেয়াল করছে তার চুল অনেক কমে যাচ্ছে। সামাদ সেই নিয়ে চিন্তায় আছে। মাথায় টাক হয়ে গেলে তো ভেজাল। সামাদের বাবা সামাদকে গোছল করিয়ে ঘড়ে শুয়িয়ে খাবার আনতে গেল। তার বাবা খায়িয়ে দিল। নিজেও কিছু খেল।
সামাদের বাবার বাজারে একটা দোকান আছে। খেয়েদেয়েই দোকানে গিয়ে বসবে। সামাদ একা হয়ে যাবে। একা একা শুয়ে থাকতে কারই বা ভালো লাগে? পাশে একটা বন্ধু থাকলে ভালো লাগত। অন্তত গল্প করার মত কেউ যদি থাকত।

ক্লাশ থ্রি-তে সামাদের অনেকগুলো বন্ধ ছিল। কিছুদিন স্কুলে যাওয়ার পরে কি যেন একটা হল তার। অনেকদিন সামাদকে হাসপাতালে থাকতে হয়েছে। তবে কিসের জন্য সেটা সামাদ জানে না। অনেক মনে করার চেষ্টাও করেছে। কিন্তু পারে নি। বেশ কিছুদিন ভালোই চলছিল। একদিন হটাৎ করে স্কুলে যাওয়ার সময় মাথা ঘুড়ে পড়ে গেল। আবার তিন-চার দিন হাসপাতালে থাকার পর বাড়িতে চলে এসেছে। কিন্তু একসময় সামাদের শরির আরো দুর্বল হতে থাকে। স্কুলে যাওয়া-ও একসময় বন্ধ হয়ে যায়। আস্তে আস্তে শরির নিস্তেজ হতে থাকে। একসময় সামাদ আর বিছানা থেকে উঠতে পারে না। স্কুলে যাওয়া একসময় বন্ধ হয়ে যায়। ভালোমতন লেখাপড়াও করতে পারে না।

সামাদের বাবা দোকানে চলে গেছে। সামাদ শুয়ে শুয়ে রাতে দেখা সেই সপ্নের কথা ভাবছিল। প্রথমে সামাদ সপ্নে দেখেছিল যে সে অনেক বুড়ো হয়ে গিয়েছিল। সে হাসপাতালে মারা যায়। আবার সামাদের স্ত্রী মারা গিয়েছিল। আবার বিয়ে করেছিল। নতুন স্ত্রী তাকে খাবারে বিষ দিয়ে মেরে ফেলল।
আবার সামার একটা মেয়েকে ভালোবেসে ছিল। সে তাকে ছেড়ে চলে যায়। শেষে সে হাত কেঁটে আত্বহত্যা করল।
শেষমেশ নকল করার অভিযোগের জন্য খাতা বাতিল হল। জলিলের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে নিজের প্রাণ হারাল। প্রতিবারেই সামাদ মারা যাচ্ছে। এবং জেগে উঠে দেখে সেগুলো সব সপ্ন।

সামাদ তখন ভাবতে লাগল, তারমানে তো হতে পারে এখন সে যেই অবস্থায় আছে সেটাও একটা সপ্ন। এমনো তো হতে পারে যে কিছুদিন পরে সে মারা যাবে আর তখনি তার ঘুম ভেঙে যাবে। কিন্তু সেটা কি সম্ভব?
সামাদ শুয়ে শুয়ে কথাগুলো ভাবতে লাগল। সামাদ তো ভালো গান গাইতে পারত। তা এখন একটু চেষ্টা করে দেখতে পারলে কেমন হয়!
একটু গান গাওয়ার চেষ্টা করল সামাদ। কিন্তু গান গাওয়া যেন সে ভুলে গেছে। অনেকদিন ধরে বেশি কথা বলা হয় না। গলা বসে গেছে।

সারাদিন এভাবে শুয়ে শুয়েই কাঁটে সামাদের। মাঝেমাঝে জানালার দিকে তাকিয়ে দেখে। বাইরের পরিবেশের দিকে তাকিয়ে থাকতে সামাদের ভালোই লাগে। তবে শুয়ে থেকে যেই জিনিসটা সবচেয়ে ভালো দেখা যায় সেটা হল আকাশ। এই কদিনে আকাশের অনেক কিছু খেয়াল করেছে সে। মাঝে মাঝে আকাশটা থাকে সম্পুর্ণ মেঘে ঢাকা। তখন সামাদের মনটা খারাপ হয়ে যায়। মনে হয় মেঘের মতই তার কষ্টগুলো ঘন হয়ে আসছে।
এক সময়কার আকাশ থাকে আংশিক মেঘে ঢাকা। তবে সেই সময় সামাদ মেঘের মধ্যে অনেক কিছু দেখতে পায়। মেঘ দিয়েই সে অনেক কিছু কল্পনা করতে পারে। সেই মেঘের আকৃতি মাঝে মাঝে হাতির আকার ধারণ করে। আবার মাঝে মাঝে একটা পোষা বিড়ালের আকার ধারণ করে। এমনকি মাঝে মাঝে সামাদ মানুষের আকার-ও দেখতে পায় সেই সাদা তুলোর মত মেঘের মধ্যে।

একসময় সামাদ ঘুমিয়ে যায়। আবার কিছুক্ষন পরেই সে ঘুম ভেঙে যায়। এভাবেই সামাদের সারাদিন কেঁটে যায়।
সন্ধ্যার পরে সামাদের বাবা আসে। সে সামাদের জন্য একটা কাজের মহিলা রেখেছে। সামাদ তাকে খালা বলে ডাকে। সে শুধু সন্ধ্যার সময় রান্না করার জন্য আসে। রান্না করেই আবার চলে যায়। এখন হয়তো খালা রান্না করছে। সামাদের বাবাও একসময় বাড়িতে এসে পরে।
সামাদ মাঝে মাঝে শুনতে পায় খালা তার বাবার সাথে কথা বলছে। খালা মাঝে মাঝেই বলে, আরেকটা বিয়ে করে ফেলতে। বাবা এখনো অনেক জোয়ান। আবার বিয়ে করা কঠিন ব্যাপার হবে না।
খালা মাঝে মাঝে বলে, এভাবে আর কতদিন মন খারাপ করে থাকবি। অন্তত এখন তো শক্ত হ।
উত্তরে বাবা কিছুই বলতে পারে না। চুপ করে থাকে। সামাদও চায় তার বাবা আবার একটা বিয়ে করুক। অন্তত একা থাকার সমাধান হবে। কথা বলার সঙ্গী হবে। কিন্তু বাবা যে কেন বিয়ে করছে না এটা বাবাই ভালো জানে। তবে কথাটা বাবাকে বললে কেমন হয়?

একটু পরেই সামাদের বাবা সামাদের কাছে আসলে সামাদ তাকে বলল, বাবা! খালা ঠিক কথাই বলছে। তুমি বিয়ে করে ফেল। আমার আর একা থাকতে ভালো লাগে না।
সামাদের কথাটা শুনেই তার বাবা যেন কেমন মনমরা হয়ে রইল। সামাদ আবার তার বাবাকে বলল, বাবা! কিছুদিন ধরে দেখছি তুমি মনমরা হয়ে থাকো। কি হয়েছে? বলো তো আমাকে।
- কই? কিছুনাতো!

সামাদ যদিও বয়সে ছোট তবে সে বুঝতে পারে। নিজের ছেলে এভাবে বিছানা থেকে উঠতে পারে না সেটা তার বাবার কাছে খারাপ লাগতেই পারে।কিন্তু সামাদ ভালোমতন সুস্থ হবে কবে? অনেকেরই তো জ্বর হয়। এমনকি সামাদের নিজেরও অনেকবার জ্বর হয়েছিল। কিন্তু তাই বলে এরকম জ্বর? যেখানে সে এক্কেবারে বিছানা থেকে উঠার শক্তিটাও হাড়িয়ে ফেলেছে।

এভাবেই আবার রাত নেমে আসে। আজকেও সামাদ সকালবেলা ঘুমিয়েছে। রাতে তাই আর ঘুম হবেনা। হয়তো আগামীকালের মতো আজকে রাতেও সামাদ সেরকম একটা সপ্ন দেখবে। আবার এমনো হতে পারে যে এখন যেটা ঘটছে সেটাও একটা সপ্ন। কিন্তু সেটা নিয়ে মাথা খাটিয়ে তো এখন আর লাভ নেই।

রাতে আবারো ঘুম ভাঙল সামাদের। কিন্তু পরক্ষণেই চমকে গেল একটা কারণে। ঘুম ভেঙেই সে দেখল তার বিছানার পাশে তার বাবা বসে আছে। ঘড়ের লাইট এখনো জ্বলছে। সামাদ আরো দেখতে পেল তার বাবার চোখ ছলছল করছে। আর সহ্য হল না সামাদের। নিজের বাবাকে বলেই ফেলল, বাবা তুমি আমার কাছ থেকে কিছু একটা লুকাচ্ছ। প্লিজ বলো না!
উত্তরে তিনি কিছু বললেন না। তাই সামাদ আরো জোর করে বলল, বাবা! তুমি যদি না বলো তাহলে কিন্তু আমি তোমাকে আর কক্ষনো বাবা বলে ডাকব না।

এবার যেন সে একটু থমকে গেল। কি বলবে এখন তার ছেলেকে? ছেলের যে ক্যান্সার! ডাক্তার বলেছিল এক মাসের মত বাঁচতে পারবে। একমাস তো প্রায় হয়েই গেল। এই কথাটা ছেলেকে বলে কিভাবে?

ছেলেকে বললে যে আরো মন খারাপ হবে। এমনিতেই শরিরের যা অবস্থা। শেষমেশ আরো অবনতির দিকে যাবে। সামাদের বাবা আমতা আমতা করে বলল, তোর তো অনেক জ্বর। তার জন্য আল্লার কাছে দোয়া চাইছি। তুইও আল্লার কাছে দোয়া কর যাতে তারাতারি সুস্থ হয়ে যাস। বাবা মুখ দিয়ে যতই মিথ্যা কথা বলুক। চোখ কিন্তু এখনো ঠিক কথাই বলছে। সামাদ দেখতে পাচ্ছে তার বাবার চোখ আস্তে আস্তে আরো ঘোলা হচ্ছে।

সকালে যখন সামাদের ঘুম ভাঙ্গল তখন সে দেখে বাইরে আলো ফুটেছে। নিজের হাত দিয়ে জানালাটা খোলার চেষ্টা করেও শেষমেশ ব্যার্থ হল। হাত যেন আগের চেয়েও আস্তে আস্তে অবশ হয়ে যাচ্ছে। অনেক চেষ্টা করেও নিজের হাতটা জানালার কাছে নিয়ে যেতে পারল না। সামাদ চিন্তা করল, তার বাবাকে ডাকতে পারলে কেমন হয়? তার বাবা তো সামাদের আগেই ঘুম থেকে উঠে।
কিন্তু সামাদ তার বাবাকে ডাকতে গিয়ে খেয়াল করল তার গলা জড়িয়ে আসছে। ঠিকমত কথা বলতে পারছে না সামাদ। কি হল তার গলার মধ্যে?
কালথেকে হাত-পায়ের ব্যাথাটা বেড়েছে। এখন সেই ব্যাথা বেড়ে অসহ্যকর পর্যায়ে পৌছে গেছে। কিন্তু এমন হচ্ছে কেন তার সাথে?

আরো বেলা হয়ে এসেছে। সামাদের বাবা তার কাছে এসে বসেছে। খালা রান্না করার জন্য এসে গেছে। আজকে সামাদ আর গোছল করবে না। সামাদের বাবা সামাদের কাছে এসে দেখে সামাদের আজকে অনেক আগেই ঘুম ভেঙে গিয়েছে। তাই সে সামাদকে বলে, আজকেও কি কোন খারাপ সপ্ন দেখেছিস নাকি?

সামাদ খেয়াল করল তার বাবা তাকে যেই কথাটা এইমাত্র বলল তার অর্থ সে বুঝতে পারছে না। সামাদ সেটা বোঝার চেষ্টা করল। কিন্তু এই মুহূর্তে যেন মাথাটা ঠিক কাজ করতে পারছে না।
সামাদের বাবা দেখল, তার ছেলে তার দিকে হা করে তাকিয়ে আছে। কিন্তু কোন উত্তর দিতে পারছে না। তখন তার বাবা তাকে হাত দিয়ে একটা ঝাকুনি দিল আর বলল, এই সামাদ? সামাদ? কথা বলছিস না কেন?
সামাদ তার বাবার দিকে চোখগুলো আরো বড় বড় করে তাকাল। তার বাবা যেন ভয় পেয়ে গেল। সামাদ জেগে আছে, অথচ কথা বলতে পারছে না কেন?
সামাদের ডাক্তার বলেছিল লাস্ট স্টেজে নাকি রোগিদের কথা বলতে ও বুঝতে সমস্যা হবে। তারমানে কি সামাদের আর বেশি সময় নেই?
কথাটা মনে করতেই তার বাবা হু হু করে কান্না আরাম্ব করে দিল।
তবে সামাদ ঝাপসা ঝাপসা চোখে দেখতে পারছে যে তার বাবার চোখ কান্নায় চক চক করছে।

বেলা অনেক হয়ে গেছে। সামাদের বাবা আজকে দোকানে যায় নি। আজকে সকাল থেকে সামাদ এখন পর্যন্ত একটা কথাও বলে নি। শুধু বড় বড় চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে।

তবে সামাদ কল্পনা করতে পারছে। সে চিন্তা করছে কেন তার সাথে এমন হচ্ছে। খোদা এমন করছেন কেন তার সাথে?
এটা কি এক ধরনের সপ্ন? ঘুম ভেঙে সামাদ হয়তো দেখবে ও সুস্থ। আবার দৌড়াতে পারবে। আবার স্কুলে যেতে পারবে। কিন্তু সেটা কবে?

সামাদের আপন খালা আজকে সামাদকে দেখতে এসেছে।
যাক! অন্তত কিছুদিনের জন্য একা থাকার সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু কথা না বলতে পারলে তো বিপদ। খালা সামাদের পাশে অনেক্ষন বসে ছিল। বসে থেকে নানান রকমের আলাপ করছিলেন খালা। সামাদ কিছু কিছু শব্দ বুঝতে পেরেছে। আর বাকিগুলো পারে নি। এই যেমন, নানু, নাবিল, নাবিলা, খেলা, স্কুল ইত্যাদি।
নাবিল আর নাবিলা সামাদের খালাতো ভাইবোন। দুজনেই সামাদের ছোট। সামাদ যখন সুস্থ ছিল তখন খালার বাড়ি গিয়ে ওদের সাথে সময় কাঁটিয়েছে। সামাদের বলার ইচ্ছে করছিল, ওদের দুজনকে তো নিয়ে আসতে পারতে। কিন্তু কথাটা মুখেই রয়ে গেল।

সামাদ মনে হয় ঘুমিয়েছিল। জেগে উঠে দেখে তার পাশে খালা নেই। কোথাও গিয়েছে হয়তো। আশেপাশে তাকিয়ে দেখে বিকাল হয়ে গেছে। দুদিন ধরে ঘুম হচ্ছে অনেক। সামাদ ইচ্ছে করেই যেন খালাকে একটা ডাক দিল। সামাদ পারল।
- খালা!
এখন তো সে ভালোই কথা বলতে পারছে। যদিও একটু সমস্যা করছে। তবে ডাকতে পারছে এটাই অনেক কিছু। সামাদ তার খালাকে আবার একটু জোড়ে ডাকার চেষ্টা করল।
- খালা!

সামাদের ডাক শুনে খালা দৌড়ে ঘড়ে আসলেন। এসেই সামাদের মাথার কাছে বসে বললেন, সামাদ? বাবা আমার! তুমিই কথা বললে? আবার আরেকটু ডাকো না-
সামাদ আবার খালা বলে ডাক দিল। সামাদের খালার মুখ খুশিতে চকচক করে উঠল। সামাদের বাবা বাইরে কিছু একটা করছে। খালা দৌড়ে গিয়ে সামাদের বাবাকে ডাকতে গেল।

সামাদের বাবা এসেই সামাদকে বলল, বাবা! কেমন লাগছে তোমার।
সামাদ আস্তে করে জবাব দিল, ভালো।
সামাদের বাবা বলল, এখন ঠিকমতো কথা বলতে পারো? উত্তরে সামাদ কেবল মাথা ঝাকাল। খালা সামাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। মায়ের আদর সামাদের অতটাও মনে নেই। কিন্তু মায়ের স্পর্শ কি কখনো ভোলা যায়? খালার হাত বুলানোর পর থেকে সামাদের মায়ের কথাগুলো হালকা হালকা মনে হতে লাগল। ঘড়ে মায়ের একটা ছবি আছে। সামাদের বাবা সামাদকে মাঝে মাঝে দেখায়।

সামাদ ভাঙ্গা ভাঙ্গা শব্দে তার বাবাকে বলল, বাবা! মায়ের ছবিটা আনতে পারবে?
সামাদের বাবা এক মূহুর্তও দাড়াল না। আলমারি থেকে ফ্রেমে বাঁধাই করা মায়ের ছবিটা এনে সামাদের বুকের উপর খাড়া করে ধরে রাখল।

ছবিটা পাওয়ামাত্র সামাদ হাত দিয়ে একবার ছবিটা স্পর্শ করল। একটা মায়াবী স্পর্শ। তারপর সামাদ সেই ছবিটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। কেন যেন সামাদের মনে হচ্ছে ছবিটা ও আর কক্ষনোই দেখতে পারবে না। মনে হচ্ছে এটাই ওর শেষ দেখা।
সামাদের চোখের এক পাশ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। সামাদের বাবা বলল, কাঁদিস না বাবা! তোর মায়ের জন্য আল্লার কাছে দোয়া কর। কবরে যেন তোর মা অন্তত একটু শান্তি পায়।

সন্ধ্যার দিকে সামাদের পায়খানা চাপল। বাবার কাধ ধরে পায়খানা করার চেয়ারে বসানো হল। অনেকদিন পর পেটটা ভালোমতন পরিস্কার হল। যেন আরেকটু সুস্থ হয়েছে সামাদ। রাতেও কিছুক্ষন তার খালার সাথে কথা বলল।

- নাবিল-রা কেমন আছে খালা?
- ভালোই আছে।
- ওদের নিয়ে আসতে পারলে না?
- আসবে! কিছুদিন পরেই আসবে। ওদের স্কুলে পরিক্ষা চলছে যে।
- আমাদের স্কুলেও তো এখন পরিক্ষা চলছে খালা। কিন্তু দিতে তো পারছি না।
খালা সামাদের মাথায় আলতো করে হাত রেখে বলল, পারবি- তুইও পারবি।
- খালা! তোমরা দুজন মনে হয় আমার কাছে কিছু লুকাচ্ছ, তাই না?
- কি বলছিস তুই?
- আমি মনে হয় মরে যাব, তাই না?

সামাদের মুখ থেকে এই কথাটা শুনে যেন তার খালার পায়ের নিচের মাটি সরে গেল। খালা মাথা শান্ত রেখে বলল, কি বলছিস এসব? তুই মরবি কেন? এমন কথা মুখেও আনবি না।
- আমারো তাই মনে হয় খালা। আমি মনে হয় এসবকিছু সপ্নে দেখছি। আমার ঘুম ভাঙলেই মনে হয় আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

খালা আর কথা বাড়াল না। খালা বিছানার পাশ থেকে চলে যাওয়ার সময় বলে গেল, বেশি চিন্তা করিস না। এখন তো ভালোমতোই কথাবার্তা বলতে পারছিস। কিছুদিন পরে দেখবি উঠেও দাঁড়াতে পারছিস। এখন ঘুমা। আবার সকালে দেখা করব।

পরদিন সকাল বেলা দেখা গেল সামাদের অবস্থা আরো খারাপ। হাত-পা আগের চেয়ে ফুলে গেছে। কথা বলাও বন্ধ হয়ে গেছে। কানেও যেন কোন কথা সামাদ শুনতে পারছে না। সামাদের বাবা অনেকবার ডাকার পরেও কোন উত্তর পাওয়া যায় নি।
সামাদের বাবার মন খারাপ। খালাও মন খারাপ করে সামাদের পাশে বসে আছে।

দুজনেই জানে সামনে কি হতে চলেছে। সামাদের বাবা সামাদকে বলল, সামাদ! তোর কি কিছু লাগবে? লাগলে আমাকে বল্।
তবে সামাদের কোন উত্তর নেই। শরিরের শক্তি যেন কমে গেছে অনেকটা। সামাদ যেন একটা ঘোড়ের মধ্যে আছে। আশেপাশে কি হচ্ছে তা বোঝার ক্ষমতা এখন ওর নেই। আবলতাবল সপ্ন দেখছে সামাদ। এই দেখছে, ও স্কুলে গিয়েছে। আবার সপ্ন গুলিয়ে যাচ্ছে। আবার দেখছে নাবিল-রা এসেছে। ওদের সাথে খেলাধুলা করছে। আবার সব গুলিয়ে যাচ্ছে। নিশ্বাস ভাড়ি হয়ে আসছে আস্তে আস্তে। ফুসফুসে বাতাস ঢুকাতে কষ্ট হচ্ছে। সামাদ যে তার বাবাকে একবার ডাক দিবে সেই খেয়ালটাও নেই এখন।

সামাদের বাবা দেখতে পেল সামাদের নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। তখনি সে বুঝে গেল যে সামাদের যাওয়ার সময় হয়ে গেছে।
ব্যাপারটা বুঝতে পেরে সামাদের বাবা সামাদের আরো কাছে গিয়ে সামাদের বুকের মধ্যে মাথা রেখে হাউমাউ করে কান্না আরাম্ব করে দিল। সামাদের খালার চোখেও পানি চলে আসল। সামাদের বাবার কান্নার শব্দ শুনে আশেপাশ থেকেও কয়েকজন মানুষ ছুটে আসল।
একসময় পুরো ঘড় লোকজনে প্রায় ভর্তি হয়ে গেল। সামাদের বাবা এখনো কান্নাই করে যাচ্ছে। এক মহিলা সামাদের কাছে এসে তার বাবাকে বলল, কান্না করবেন না ভাই। কালেমা পড়ুন। কয়েকজন মহিলা সামাদের কাছে এসে জোরে জোরে কালেমা শাহাদাত পড়তে আরাম্ব করল।

তবে সামাদ এগুলোর কিছুই বুঝতে পারছে না। তাদের ঘড়ে যে এতো মানুষ এসেছে তা সে কিছুই জানে না। একসময় যেই সামাদের একা একা থাকতে ভালো লাগত না। একটা মানুষের সাথে কথা বলার জন্য ছটফট করত। সেই সামাদদের ঘড়ে আজকে অনেক মানুষ। কিন্তু নিজের কথা বলার সাধ্য নেই।

সামাদ নিজে কল্পনা করার ক্ষমতা হাড়িয়ে ফেলেছে। এখন যা কিছু দেখছে সব একটা ঘোড়ের মত। অতিতের সৃতিগুলো খুব মনে পড়ছে। নিজের ছোড়বেলার সৃতি, মায়ের ভুলে যাওয়া দৃশ্যগুলোও এখন সে চলচিত্রের মত সামনে দেখতে পারছে। সে দেখতে পাচ্ছে তার মা তাকে কোলে নিয়েছে, খায়িয়ে দিয়েছে, গোছল করিয়ে দিয়েছে। সামাদের বাবা সামাদকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেওয়ার দৃশ্যগুলোও সামাদ এখন সপ্নের মত দেখতে পাচ্ছে।
যন্ত্রনা শুরু হচ্ছে। প্রচন্ড যন্ত্রনা। সেটা কাউকে বলে কখনো প্রকাশ করা যাবে না। কিন্তু বলবেই বা কিভাবে?
যেন মনে হচ্ছে কেউ নিজের চামড়াগুলো টেনে টেনে টেনে খুলে নিচ্ছে। কিন্তু এটার প্রতিবাদ করা অসম্ভব। এখন শুধু মৃত্যুর অপেক্ষা। কখন আসবে সেই মৃত্যু? কখন সে মুক্তি পাবে এই অসহ্য যন্ত্রণা থেকে? মনে হচ্ছে তার বেশি দেরি নেই। শিগ্রই। এই পৃথিবী আর কখনো নিজের চোখে দেখা হবে না। সুন্দর রোদে মাখা সকাল, আকাশের সেই তুলোর মত মেঘ, মেঘের মধ্যে থাকা সেই কল্পনার হাতি, কোনকিছুই আর দেখা হবে না।

একসময় সেই কষ্ট থেকে মুক্তি পেল সামাদ। যাক! এখন তো অন্তত ভালো লাগছে। শরিরটা হালকা লাগছে, শক্তিও যেন ফিরে এসেছে। সামাদ আশেপাশে তাকিয়ে দেখল। সবকিছুই তো ঠিকই আছে। তাহলে বাবা এতো কান্না করছে কেন? আর খালার চোখেও তো পানি দেখা যাচ্ছে। আর আশেপাশে এতো মানুষ কেন?
সামাদের মনে আছে, যখন তার মা মারা গিয়েছিল তখনো ঠিক এইরকমই মানুষ এসেছিল এই ঘড়ে।

সামাদের যেন মনে হচ্ছে এখন সে বিছানা থেকে উঠতে পারবে। চেষ্টা করে দেখা গেল আসলেই সামাদ খুব সহজেই বিছানা থেকে উঠতে পারল। অনেক দিন পর যেন নিজের শক্তিতে বিছানা থেকে উঠল। কিন্তু এটা তো খুশির সংবাদ! তাহলে সবাই কেন কান্না করছে? সামাদ তার বাবার কাঁধ ধরে ঝাঁকানোর চেষ্টা করল। কিন্তু দেখা গেল তার বাবাকে এক সুতাও নড়ানো যাচ্ছে না। সামাদ ব্যার্থভাবে অনেক ঝাকানোর চেষ্টা করল আর কানের কাছে গিয়ে বাবা বাবা বলে অনেকবার ডাকল। কিন্তু তার বাবা অনবরত কেঁদেই যাচ্ছে। কি হচ্ছে তার সাথে এসব?

নিজের খালাকে অনেকবার ডেকেও কোন লাভ হল না। কি করবে এখন সামাদ? সামাদ আশেপাশে তাকিয়ে দেখল। অনেক লোক এতোক্ষনে জড়ো হয়ে গেছে। কিন্তু নিজের পেছনের দিকে তাকিয়ে সামাদ একটা দৃশ্য দেখল, যেটা দেখার জন্য সে নিজেও প্রস্তুত ছিল না। সামাদ দেখল তার মত একই চেহারার একটা ছেলে বিছানায় নিথর হয়ে শুয়ে আছে। সামাদের বাবা সেই ছেলেটার দিকে তাকিয়েই কান্না করছে। নিজের চোখে নিজের মত একজনকে দেখে সামাদ রীতিমত ভয় পেয়ে গেছে।

অনেক সময় পেরিয়ে গেছে। বাবার কান্না এখন থেমেছে। সামাদ তার বাবাকে আরো অনেকবার ডাকার চেষ্টা করেছে,
- এইতো বাবা! আমি এখনো বেঁচে আছি। আমি ভালো হয়ে গেছি বাবা। আমি আবার আগের মত হাঁটতে পারছি। এখন আমি আবার স্কুলে যেতে পারব। এদিকে তাকাও বাবা-

কিন্তু সামাদের বাবা এসব খেয়ালই করছে না। সামাদের লাশটা ঘড়ের মাঝখানে কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। সামাদ তার চারদিক দিয়েই ঘুড়ছে, আর সবাইকে ডাকার চেষ্টা করছে। কিন্তু কোন লাভ হচ্ছে না।
একসময় সামাদ দেখল নাবিল-নাবিলারাও এসেছে সামাদের লাশ দেখতে। ওদেরও সামাদ অনেকবার ডাকার চেষ্টা করল।
- অন্তত তোরা আমার কথাটা শোন!
কিন্তু সামাদের ডাক তারাও শুনল না।
সামাদের লাশ দেখে ওরা দুজনেও অনেক ঘাবড়ে গেছে। এরকম দৃশ্য দেখতে সামাদের আর ভালো লাগছে না। আর কতক্ষন দেখবে সামাদ এসব? এগুলোও কি একটা সপ্ন? হলে তো ভালোই হত।

উঠানের এক পাশে গরম পানি করা হচ্ছে। পানিটা মনে হচ্ছে একটু বেশিই গরম হয়ে যাচ্ছে। খুব কষ্ট লাগছে নিজের দেহটাকে এভাবে নিথর হয়ে থাকতে দেখে।

সামাদের লাশটাকে গোছল করানোর জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। নিজের মৃত লাশের মধ্যে এভাবে গরম পানি ঢালাতে সামাদের অনেক খারাপ লাগছে। কিন্তু কিছু করার নেই।

সামাদ আশেপাশ দিয়ে ঘুড়েই চলেছে। একটু পরে জানাজা পড়ানো হবে সামাদের। নিজে যে মরে গেছে এই কথাটাই সামাদ এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না। নিজেকে এখন খুব সুস্থই মনে হচ্ছে। হাটতে পারছে, দৌড়াতে পারছে, সবই করতে পারছে। কিন্তু কেউ সামাদকে দেখতে পারছে না।

জানাজা নামাজ শুরু হওয়ার আগে মসজিদের ইমাম অনেক কথাবার্তা বলল। সবাইকে বোঝানোর চেষ্টা করল, জন্মের একটা ধারা আছে, কিন্তু মরণের কোন ধারা নেই। সামাদের বাবা এখনো জোয়ান। অথচ ছেলেটা মারা গেল। গ্রামের সবার মুখেই চিন্তার ছাপা। কোন বৃদ্ধ লোক মারা গেলে গ্রামের কেউ অতটা কষ্ট পায় না। কিন্তু এতো অল্প বয়সের একটা ছেলে মারা যাওয়ায় গ্রামের সবার মুখেই বেদনার ছাপ।

সামাদ সেখান থেকে অনেক দূরে বসে এসব দৃশ্যগুলি দেখছিল। এভাবে যে মরে যাবে সে কল্পনাই সামাদ করতে পারে নি। সামাদ অপেক্ষায় ছিল হয়তো এবার তার ঘুম ভেঙে যাবে। কিন্তু তা হচ্ছে না। হয়তো এটা বাস্তবেই ঘটছে। সময় যেন আপন গতিতে চলছেই।